দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

মমতার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বনাম রাজ্যবাসীর প্রাপ্তি — পৃঃ ১২

বিজেপির সংকল্পপত্রে রয়েছে অর্থনীতির হাল ফেরানোর দিশা — পৃঃ ২৪

৭৩ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ৫ এপ্রিল, ২০২১।। ২২ চৈত্র - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২ ।। website : www.eswastika.com

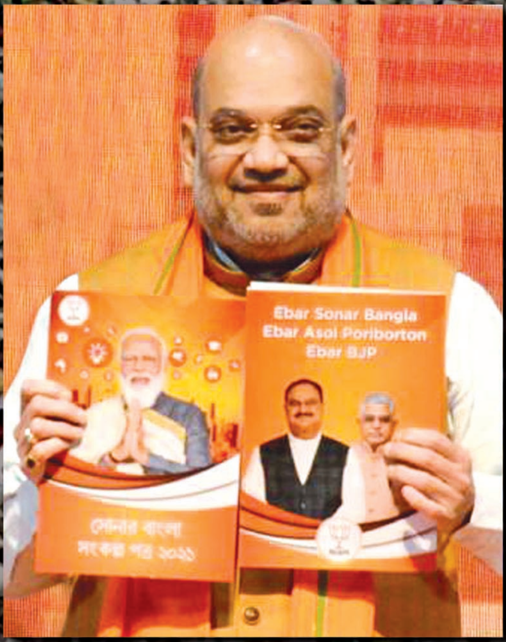

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বনাম রাজ্যবাসীর প্রাপ্তি

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে
ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী
অর্ণব রায় কে
আসল
পরিবর্তনের
লক্ষ্যে
বিজেপি
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

(২)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ২২ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৫ এপ্রিল - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

আমও গেল, ছালাও গেল মমতার □ বিশ্বামিত্র □ ৬

ও দিদি পায়ে পড়ি রে... □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজ্ঞার দ্বৈরথ ও দেশ
□ গুরুচরণ দাস □ ৮

বিজেপির সংকল্পপত্রে সোনার বাঙ্গলা গঠনের প্রতিজ্ঞা
□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১০

মমতার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বনাম রাজ্যবাসীর প্রাপ্তি
□ হীরক কর □ ১২

ভারত বিশ্বের কল্যাণে নিজের ভূমিকা যথাযথ পালন করবে
□ ১৬

বিজেপির সংকল্পপত্রে রয়েছে অর্থনীতির হাল ফেরানোর দিশা
□ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ২৪

মাননীয়ার বহিরাগত তত্ত্ব ভয়ংকর সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিল বাঙ্গালিদের □ ক্রিস্টোফার রক্ষিত □ ৩১

থর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া লুনি নদীর হদিশ
□ কৌশিক রায় □ ৩২

বঙ্গবীর বিজয় সিংহ এক বিস্মৃত অতীত □ প্রকাশ দাস □ ৩৩

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে সিঁদুরে মেঘ
□ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৩৫

প্রতিকূলতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ বেড়েই চলেছে
□ ড. জিষ্ণু বসু □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □
অন্যরকম : ৩৯ □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **স্মরণে : ৪৯-৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১২ এপ্রিল
২০২১

প্রকাশিত হবে
১২ এপ্রিল
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সংকটে বাঙ্গালিয়ানা

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা একটি বছর পার করে আমরা উপস্থিত হয়েছি ভ্যাকসিন যুগে। যদিও দেশের কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ। কিন্তু তার জন্য উৎসব থেমে নেই। কিছুদিন আগে সারা দেশে মহাসমারোহে পালিত হয়েছে দোল উৎসব। বাঙ্গলা নববর্ষেরও আর বিশেষ দেরি নেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা বাঙ্গলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। বিষয়— সংকটে বাঙ্গালিয়ানা। গত পাঁচ দশকের বাম ও তৃণমূল শাসনে সংকটাপন্ন বাঙ্গালিয়ানার নানা দিক তুলে ধরবেন সুজিত রায়, বিনয়ভূষণ দাশ, প্রবাল চক্রবর্তী, অভিমন্যু গুহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, প্রবীর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংকল্পপত্রেই পশ্চিমবঙ্গের উত্তরণ ঘটিবে

প্রতি বৎসর নির্বাচনের পূর্বক্ষণে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতির ডালি সাজাইয়া ভেটারদিগের সামনে ভোটভিক্ষা করিত আসে। যে দল নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হইতে পারে না, প্রতিশ্রুতির বিষয়ে ভোটাররা সেই দলের নিকট জবাবদিহি চাহে না। কিন্তু যাহারা নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, জনগণ বা ভোটাররা তাহাদের নিকট জবাবদিহি চাহিতেই পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণ দীর্ঘদিন শাসকদলের রক্তচক্ষুর ভয়ে জবাব চাহিতে পারে নাই। পাঁচ বৎসর পর তাহারা আবার প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি লইয়া আসে। প্রতিশ্রুতিপত্রকে তাহারা গালভরা নাম দিয়াছে ইস্তেহার। চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া বামেরা এইরূপ ইস্তেহার প্রকাশ করিয়া ভোটারদের সামনে আসিত। এখনও আসিতেছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় থাকিবার সময় তাহারা কাজের কাজ কিছুই করে নাই। চৌত্রিশ বৎসরে তাহারা এই রাজ্যকে সর্বদিক হইতে সর্বহারা করিয়া ফেলিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব হইতেই কলকাতার উত্তরে নৈহাটি হইতে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীর শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল বলিয়া পরিচিত ছিল। দিবারাত্র কলকারখানার চিমনি হইতে ধূম নির্গত হইত। কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত থাকিত। রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ তাহাতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। শুধু এই রাজ্যেরই নহে, বিহার, উত্তরপ্রদেশ হইতেও হাজার হাজার মানুষ সেই কলকারখানায় কাজ করিতে আসিত। বামেদের চৌত্রিশ বৎসরের লালঝান্ডার দাপটে সেই কলকারখানাগুলিতে লালবাতি জ্বলিয়াছে। সেই স্থানগুলিতে তাহাদেরই আশ্রিত প্রমোটাররা বিলাসবহুল আবাসন গড়িয়া তুলিয়াছে। ফলস্বরূপ এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হইয়া ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়াছে। এই হেন বামেরা লজ্জার মাথা খাইয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি লইয়া আবারও ভোটারদের সামনে হাজির হইতেছে।

বর্তমান শাসক তৃণমূলের দশ বৎসরের রাজত্বকালে রাজ্যবাসীর নাভিঃশ্বাস উঠিয়াছে। রাজ্যবাসীর চাহিদা তাহারা পূরণ করিতে পারে নাই। তবু তাহারা এইবার তাহাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বৎসরে দশ লক্ষ নূতন ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি এবং পাঁচ বৎসরে দুই হাজার বড়ো শিল্প ইউনিট স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া রাজ্যবাসী তাহাদের দেখিয়াছে, তাই তাহাদের গালভরা প্রতিশ্রুতিকে তাহারা সন্দেহের চোখে দেখিতেছে। প্রতি বৎসর তাহারা ঘটা করিয়া শিল্প ও বাণিজ্য সম্মেলন করিয়াছে। কিন্তু তাহার কোনো লাভ তাহারা ঘরে তুলিতে পারে নাই। ভোটারদের প্রলুব্ধ করিবার জন্য এইবার তাহারা আরও নানাপ্রকার মিথ্যার ঝুড়ি সাজাইয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

ভারতীয় জনতা পার্টিও তাহাদের প্রতিশ্রুতিপত্র ভোটারদের সামনে রাখিয়াছে। উল্লেখযোগ্য হইল, তাহারা প্রতিশ্রুতিপত্রকে 'ইস্তেহার' না বলিয়া সংকল্পপত্র বলিয়াছে। ভারতীয় জনতা পার্টির ইহাই সর্বভারতীয় পদ্ধতি। তাহারা জনগণের কাজ করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখিয়াছে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনগণের সামনে যাহা সংকল্প করিয়াছে তাহা পূরণ করিয়াছে। এই রাজ্যের নির্বাচনী সংকল্পপত্রে তাহারাও নানাবিধ ঘোষণা করিয়াছে। উল্লেখ করিতেই হইবে, তৃণমূলের তুলনায় বিজেপি তাহাদের সংকল্পপত্রে বহু ইতিবাচক পদক্ষেপ লইয়াছে। সংকল্পগুলি রূপায়িত হইলে পশ্চিমবঙ্গ যে সোনার বাঙ্গলায় পরিণত হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, বিজেপির সংকল্পপত্র রূপায়ণের এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে? রাজ্যটিকে তো প্রথমে বাম ও বর্তমানে তৃণমূল সরকার দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার উত্তর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিয়াছেন। তাঁহারা আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, অনেক ভাবিয়াই সংকল্পপত্র তৈয়ারি করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হইলে তাহা হইবে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের ঘোষিত সংকল্প রূপায়ণ করিতে সর্বপ্রকারে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করিবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভাবনাই বলিয়া দিতেছে যে, বিজেপির হাত ধরিয়াই পশ্চিমবঙ্গের উত্তরণ ঘটিবে।

সুভাষিতম্

কুসঙ্গত্বে কুবুদ্ধি স্যাৎ কুবুদ্ধেশ্চ কুচেষ্টিতম্।

কুচেষ্টাতো ভবেৎ প্রাণী বিপদাং ভাজনং পুনঃ।।

কুসঙ্গ করলে কুবুদ্ধি হয়। কুবুদ্ধি কুকাজের জন্ম দেয়। কুকাজের অবশ্যম্ভাবী ফল — বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া।

আমও গেল ছালাও গেল মমতার

বিশ্বামিত্র

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে ভোটপ্রচারে গিয়ে বলেছেন, ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ বাপ-ব্যাটার অর্থাৎ শিশির অধিকারী-শুভেন্দু অধিকারীর মদত ছাড়া পুলিশ সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশের নৃশংস তাণ্ডবে ১৪ জন নিরীহ মানুষ মারা যান। এই ঘটনা সেই সময় রাজ্য-রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলেছিল। সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমে চৌত্রিশ বছরের বাম জমানার অবসান হয়েছিল। এই আন্দোলনের কিছু নেতিবাচক দিক পরে বের হয়েছিল, যেমন নকশালরা এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে রাজ্য-রাজনীতিতে ঠাঁই করে নিয়েছিল, মুসলমান মৌলবাদও প্রশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নন্দীগ্রাম জমি রক্ষার আন্দোলন অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ সিপিএম নামক জগদ্দল পাথরটিকে অপসারিত করার পথে এই আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। আন্দোলনের মূল স্থপতি ছিলেন মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র, কাঁথির অধিকারী পরিবার। অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল। বিশেষ করে তিনি এই ঘটনাকে বিজেপির সাহায্যে সর্বভারতীয় রাজনীতির অঙ্গ করে তুলতে পেরেছিলেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফসল তিনি ঘরে তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কুর্সিতে বসে। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সবচেয়ে লাভবান যদি কেউ হন তবে তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বারো বছরে রাজ্য-রাজনীতিতে দেখা গিয়েছে মমতা একবার ক্ষমতায় এলে তার অতীতকে মনে রাখেন না।

কিছু উদাহরণ দিই। মণীশ গুপ্তকে প্রথম তৃণমূল সরকারে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী করা হয়েছিল, দ্বিতীয়বার বিধানসভা ভোটে হারার পর তাকে আবার রাজ্যসভা থেকে জিতিয়ে আনা হয়। এই মণীশ গুপ্ত যিনি ১৯৯৩ সালে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব থাকাকালে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ১৩ জন নিরীহ যুবক ওই ঘটনায় নিহত হন। একইভাবে নন্দীগ্রামে গুলি চালানোর ঘটনায় (যাতে নিহত হন ১৪ জন) মূল অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার সত্যজিৎ ব্যানার্জিকে দলে নিয়েছেন সাদরে।

মমতা ব্যানার্জির ভুললে চলবে না অগণিত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অজস্র রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিএমের দুঃশাসনকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তিনি একাই আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন, এর ফল তিনি একাই ঘরে তুলতে চেয়েছেন। যার সহজ নমুনা হলো, সিপিএমের পুলিশের যাবতীয় মার থেকে যিনি নেত্রীকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন, যিনি বামেদের হাতে মাথা কাটার আমলেও অকুতোভয়ে তাদের সঙ্গে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন, সেই সোনালি গুহকে এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী না করা। দলের দুর্দিনে সোনালি জ্যোতি বসুর ছেড়ে যাওয়া আসন সাতগাছিয়ায় জয়ী হয়েছিলেন। তিনি যাতে জ্যোতিবাবুর টানা পাঁচবার সেখানকার বিধায়ক হওয়ার রেকর্ড ছুঁতে না পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা!

সুতরাং মমতা শুধু ব্যর্থ-প্রশাসকই নন, একজন আত্মদম্ভী, অহংকারী মহিলা, যিনি দুঃসময়ে পাশে থাকা সহযোদ্ধাদের মনে রাখেন না। তাঁর দলের পুরনো কর্মীদের মধ্যে ভাঙনের বড়ো কারণ এটাই। তাই নন্দীগ্রামের সংগ্রামমুখর অধ্যায় তিনি ভুলে গেছেন। শুভেন্দু সেখানে রবিনহুডের মর্যাদা পাচ্ছেন, তাই নির্লজ্জতার যাবতীয় সীমা অতিক্রম করে মমতা ভোটপ্রচারে অধিকারী পরিবারের নাম না করে এ কথাও বলেছেন যে, ২০০৭-এ যেমন চটিপরা কিছু বহিরাগতকে প্রবেশ করানো হয়েছিল নন্দীগ্রামে, এবারেও সেই চেষ্টা হবে। মমতা ভুলে গিয়ে থাকলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কলকাতা হাইকোর্ট নন্দীগ্রামের ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল, ২০০৭-এর ১৪ মার্চ পুলিশের পেছন পেছন প্রায় আটশো সশস্ত্র সিপিএম ক্যাডার নন্দীগ্রামে ঢুকেছিল। মমতা তার তুচ্ছ লাভের জন্য ইতিহাসকে এভাবে পালটাতে পারেন না। মমতার কথায় অবশ্য সবচেয়ে খুশি সিপিএম। তারা এখন মমতাকে 'সততার প্রতীক' মান্যতা দিচ্ছে, পারলে অসুস্থ বুদ্ধবাবুকে রোগশয্যা থেকে তুলে এক ঝাঁক তরুণের নেতৃত্ব দিতে তাঁকে পথে নামিয়ে দেয়। একটা চিঠি অবশ্য নিজেরা লিখে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মানুষ ভোলেনি বুদ্ধবাবুর নন্দীগ্রাম-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাবুর অহংপূর্ণ উক্তি : 'দে হ্যাভ বিন পেড ব্যাক দেয়ার ওন কয়েন্স'। সুতরাং তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে যে লাল দাগ লেগেছে, তা কারুর খেয়ালখুশিতে মুছে যাবে না। আর মমতার প্রধান শত্রু বিজেপি বা অধিকারী-পরিবার। তাই ইতিহাস নিয়ে তাঁর এই ছেলেখেলা, মিথ্যাভাষণ। কিন্তু প্রশ্ন, এত করেও শেষরক্ষা হবে কি? একপক্ষের ভোটের হার গত লোকসভাতেই সাত শতাংশে নেমেছিল, এবার নন্দীগ্রামের মানুষ কুলোর বাতাস দিয়ে হলদি নদীর পার থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন। সুতরাং ওদিকের কিছু ভোট মমতার কপালে জুটবে বলে মনে হয় না। এবারের নির্বাচনে তাই বলতেই হয় বৃথা চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আমও যাচ্ছে, ছালাও যাচ্ছে।

□

ও দিদি, পায়ে পড়ি রে...

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

ভোটের মধ্য গগনে বাঙ্গলা। এমন একটি সময়ে লেখা চিঠিতে অনেক কথাই লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। গুলিয়ে দিচ্ছেন দিদিমণি। নন্দীগ্রামে দাঁড়ানো থেকে তিনি একের পর এক যা যা করছেন তাতে আমিও মাথার ঠিক রাখতে পারছি না।

চক্রান্তের অভিযোগ একবার দুর্ঘটনার মুহূর্তেই করেছিলেন। বলেছিলেন, ৪-৫ জন মিলে ঠেলে দিয়েছে। পরে গাড়ির দরজায় আঘাত লাগার কথা বললেও ভোটের দুদিন আগে হঠাৎ সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারীর দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'ভোটের সময় তুই আমার পা জখম করিয়েছিস।' সেই সঙ্গে মমতা বলেন, 'আমি চেপে গেছি ভদ্রতা করে। আজও আমায় ভাঙা পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসে মিটিং করতে হচ্ছে। তোমার নির্দেশ ছাড়া এ সব হতে পারে না।' চক্রান্ত করে তাঁর পায়ে আঘাতের কথা বলে মমতা নন্দীগ্রামের মানুষকে অপমান করেছেন বলে সরব বিজেপি। কাঁথির সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখেও একই কথা শোনা গিয়েছে। সোমবার তারও পালটা মন্তব্য করলেন মমতা। বললেন, 'নন্দীগ্রামের কোনও লোক এসব করতে পারে না। বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে এসব করিয়েছ তুমি।' কখনও তুই, কখনও তুমি বলে যা যা বললেন তাতে আমার মনে একটাই প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী তো দেখছি সবই জানেন, কিন্তু কিছু করলেন না কেন? এখন বলছেন নন্দীগ্রামে গণহত্যার দিন কারা পুলিশ ঢুকিয়েছিল তিনি সেটা জানতেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে সেই অন্যায়ের জন্য ব্যবস্থা নিলেন না কেন?

মমতা বলেন, 'আমি বাইরের মেয়ে? তুই ব্যাটা কোন হরিদাস কাঁথির ছেলে, কী করে বেড়াস? তুই কবে নন্দীগ্রামের ছেলে হলি? তুই কী করে ভূমিপুত্র হলি? তোর তো এখানে ভূমিও নেই, জমিও নেই। তুই তো দালালি করে গেছিস। আগে সিপিমের দালালি করেছিস, এখন বিজেপি-র দালালি করছিস। কী দিইনি তোকে?' এখানেই না থেমে মমতা বলতে থাকেন, 'তোকে পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী করেছি। তোকে পরিবেশ দপ্তর, সেচ দপ্তরের মন্ত্রী করেছি। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান করেছি। তোর বাবাকে দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান করেছি, তোর ভাইকে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান করেছি।' এছাড়াও তাঁকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বলেও দাবি করেন মমতা। অধিকারীদের লক্ষ্য করে সোমবার আরও অভিযোগ করেন মমতা। বলেন, 'কী নেই ওদের? পেট্রোল পাম্প থেকে শুরু করে লঞ্চ থেকে শুরু করে, ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে আইটিআই থেকে শুরু করে ট্রলার থেকে কী নেই?' সোমবার নন্দীগ্রামের সভা থেকে হুঁশিয়ারির সুরও শোনা যায় মমতার গলায়। তিনি বলেন, 'আমরা খেলা খেলি ভদ্র ভাবে। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ লাগতে এসো না। আমাকে আঘাত করলে আমি আগুনের মতো ঝরে পড়ি, সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

এসব শুনে আমার আবার একগাদা প্রশ্ন মাথায় আসছে। আচ্ছা দিদি, প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলা গেলে মুখ্যমন্ত্রীকে বলা যাবে না কেন? এসব 'বহিরাগত' আক্রমণ তো দিদিভাই আপনিই শুরু করেছেন। এবার আর একটা কথা। দিদি আপনি অধিকারী পরিবারকে এত পাইয়ে দিয়েছিলেন সত্যি! আপনি যখন বলছেন তখন সত্যি। ভাগ্যিস ওঁরা দল বদলেছেন তাই এসব ফাঁস করলেন আপনি। তা হলে আরও আপনার যে সব ভাই, ভাইপোর পরিবার রয়েছে তাঁদের আপনি কী কী পাইয়ে দিয়েছেন সেগুলো কবে বলবেন? নিজের পরিবারের ভাই, ভাইপো ছাড়াও তো আপনার অনেক ভাই। যাঁরা গত ১০ বছরে বেশে ফুলেফেঁপে উঠেছেন। তাঁদের যা যা পাইয়ে দিয়েছেন সেগুলোও মানুষ জানতে চায়। তাঁরা কবে দলবদল করবেন এবং আপনি বলবেন সেটা শোনার অপেক্ষায় রইলাম। ◻

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার

যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

অতিথি কলম

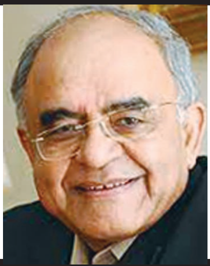

গুরুচরণ দাস

অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজ্ঞার দ্বৈরথ ও দেশ

দিল্লিতে ২০১৪ সালে প্রথম এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের যথার্থ ইতিহাস, সংস্কৃতি সভ্যতাকে সত্যের কষ্টিপাথরে তুলে দেশের মানুষ তথা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদানের প্রক্রিয়া চালু হয়। সম্প্রতি সম্পূর্ণ নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উচ্চশিক্ষায় আইআইটি বাদ দিলে লিবারেল আর্টসের ক্ষেত্রে জেএনইউ বললেই আমরা কেমন লালায়িত হয়ে উঠি। অথচ এখানে ভারতের শিক্ষা ও কৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বিকৃত একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলে ধরা হয়। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই ২০১৪ সালে দিল্লির অনতিদূরে হরিয়ানার সোনিপতে গড়ে ওঠে অশোক বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাধারার গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতকে তুলে ধরাই ছিল এর এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য। এটি অনুদানের ভিত্তিতে চলা সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থ জড়িত থাকলেও এখনকার পরিচালন পর্যদে তাদের কোনো প্রাধান্য দেওয়া হয় না। এর পরিচালন গোষ্ঠী সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। এখানকার আচার্য বা Chancellor ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সিয়ান ইতিহাসবিদ রুদ্রাংশু মুখার্জি। উপাচার্য মালবিকা সরকার। এই নামগুলি শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাসচর্চা ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত।

উপরিউক্ত মুখাবন্ধের পর সাম্প্রতিক একটি ঘটনা কালো মেঘ টেনে এনেছে। গত সপ্তাহে স্বানামধন্য জেএনইউ-এর পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের একজন নীতিগত বিরোধী পদত্যাগ করেছেন। তিনি একটি চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন পদত্যাগের স্বপক্ষে। তিনি নিজেকে সংস্থার রাজনৈতিক বোঝা বলে মনে করে সরে গেছেন। প্রচার মাধ্যম ঘটনাটিকে যথারীতি শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব বলে রং চড়িয়েছে। বাস্তবে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এটি খুবই বেদনাদায়ক।

বাস্তবে এটি দুই আধুনিক ভারতীয় নায়কের কাহিনি। প্রথমজন অসমসাহসিকতার সঙ্গে ক্ষমতার শাসনে সত্যকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। অন্যজন কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের অনুকরণে উন্নততর পৃথিবী তৈরির ভাবনায় আচ্ছন্ন। উভয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্যে কোনো অবহেলা করেননি। কিন্তু এর সমাপ্তিটি মোটেই প্রশংসনীয় হলো না। তাঁরা যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে প্রচেষ্টা শুরু করেন সেটি কোনো স্বপ্নে গড়া খুঁতহীন পরিমণ্ডল নয়। বলা যায় কিছুটা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, উৎকট ভাবনার রাজনৈতিক দলাদলি, সভ্যতাহীন পারস্পরিক যুদ্ধের মহড়া ও ঘৃণার বাতাবরণ। কালক্রমে যা এই দুই নায়কের খানিকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

প্রথম নায়ক আশিস ধাওয়ান তাঁর লালিত স্বপ্নে একটি বিশ্বমানের, মুনাফাহীন লিবারেল আর্টস (সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন ইত্যাদিকেই লিবারেল আর্টস বলা হয়) চর্চার সংস্থা করে তোলার কথা ভাবেন। যেখানে অর্ধেক ছাত্র বৃত্তির ভিত্তিতে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। এই ভদ্রলোক কলকাতার একটি ভদ্র পেশাগত পরিবারে বড়ো হন। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে পাশ করার পর বিশ্বখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। যেখানে তাঁর কাছে উদার কলাবিদ্যা শিক্ষার এক মুক্ত প্রাঙ্গণ উন্মোচিত হয়। এরপর তিনি হার্ভার্ডের বিজনেস স্কুল ঘুরে সম্পূর্ণ বিপরীত ইনভেস্টমেন্ট ওয়ার্ল্ড-এ ঢুকে পড়েন।

কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে মাতৃভূমি তাঁকে ফিরিয়ে আনে। Chrys Capital নামে একটি স্টার্টআপ শুরু করেন যার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের স্টার্টআপ-এ উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দান। এই সময়ই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে তাঁর বোর্ডে যোগ দিতে ডাকেন। এক যুগ পরে এই সংস্থা বিপুল সাফল্যের মুখ দেখে। কিন্তু ঠিক সেই

উত্তুঙ্গ সময়েই ধাওয়ান সংস্থা ছেড়ে দেন। আরও কিছু তাঁরই মতো স্বপ্ন দেখা তরতাজা তরুণদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে থাকেন যাতে তাঁর আদি স্বপ্ন পূরণ করা যায়। বিগত ১০ বছর ধরে (১১ সালে ভাবনা শুরু হয়) তিনি কায়মনোবাক্যে অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে স্বোপার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে ঢেলে চলেছেন। অন্য নায়কটি প্রতাপভানু মেহতা। যিনি যোধপুরের একটি মধ্যবিত্ত জৈন পরিবারে বড়ো হয়েছিলেন। সিমলার St Edward ও জয়পুরের St Xaviers-এ পড়ার পর তিনি অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ও বিখ্যাত মার্কিন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। তিনি প্রথমে হার্ভার্ডে পড়াতে যান যেখানে আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। ভারতে ফিরে এসে তিনি তদানীন্তন Centre for Policy Research-এ যোগ দিয়ে এটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধিক সততা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্থার পরিচিতি বাড়ে। এরই পাশাপাশি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি ও সুনাম গড়ে তোলেন সাপ্তাহিক কলমে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে। এরই মাঝে অশোক বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু নীরবে তাঁর ভিত্তি ভূমি তৈরি করে উদারবাদী কলাচর্চার উৎকর্ষের প্রতিষ্ঠান হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে। আমাকে এখানে একটি বক্তৃতাসভায় ডাকা হয়। এর পরিকাঠামো ও আবহ দেখে আমার মাথা ঘুরে যায়। আমিও একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমার ভালো অঙ্কের সঞ্চয় আমি এখানে উৎসর্গ করি। ২০১৭ সালে অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাওয়ান মেহতাকে উপাচার্য হওয়ায় আহ্বান জানান। আমার মনে হয়েছিল এটিই শ্রেষ্ঠ মিলন।

এর একটু পর থেকেই নানা উপসর্গ শুরু হয়। মেহতার তীব্র সরকার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবিয়ে তুলতে থাকে। ধাওয়ান অবশ্য মেহতাকে নিরস্ত করার চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন। আমিও কিছুটা দূরত্বে থাকা চিয়ার লিডারের ভূমিকায় থাকি। বুঝতেও পারিনি আসন্ন ঝড়ের সংকেত— যতক্ষণ না এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাওয়া হয়। আমি বলেছিলাম সে যেমন লিখে যাচ্ছে যাক তবে বাই লাইন থেকে অশোক শব্দটি বাদ দিক। কিন্তু ২০১৯ সালে মেহেতা উপাচার্যের পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে থেকে যেতে চাইলেন। এমনই একদিন সন্ধ্যের মধ্যে চর্চায় আমি আমার অত্যন্ত হৃদয়গর্ভ বিষয় ভারতচর্চা ও সংস্কৃত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশ্বমানের বিভাগ খোলার প্রস্তাব দিই। মেহতা সঙ্গে সঙ্গে জানান--- 'balancing his administrative duties with his aeademic interest' তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর হাতে ছিল অপরিমিত স্বাধীনতা কিন্তু পড়াবার সময় তিনি কিছুতেই করে উঠতে পারতেন না। মেহতা বললেন, অশোক একটি আসাধারণ সাফল্যের গল্প। পঠনপাঠনের মূল্যবোধের ওপর এর দায়বদ্ধতা, পদ্ধতিগত সংহতি এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী যে অসাধারণ বৌদ্ধিক প্রতিভার সমাহার এখানে হয়েছে তা যথার্থই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে উৎসকের্ষর ক্ষেত্রে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

আমি ভেবেছিলাম সবই তাহলে ঠিক আছে। তাই যখন শুনলাম মেহতা অশোক থেকে ইস্তফা দিয়েছে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। এর পরেরদিনই আরও এক বিদগ্ধ মানুষ সুব্রহ্মনিয়ামও সমবেদনা মূলক ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি অশোক আর ঠিক মতো পঠনপাঠনের মুক্ত চিন্তা বজায় রাখতে পারছিল না। ৯০ জন faculty member মেহতার সঙ্গে সহমত হয়েছেন। হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, এমআইটি আরও বহু বিখ্যাত নাম যা আপনার মনে আসবে এমন ১৫০ জন বিদ্বজ্জন হঠাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত চিন্তার দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাল মিলিয়ে পড়ুয়ারা দুদিন ক্লাস বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হায়! অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিল তিল করে অর্জিত সুনাম বরাবরের জন্য ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হলো। এই পরিস্থিতির শুরুতে হঠাৎ যখন মেহতা পদত্যাগ করলেন কেউই কিন্তু জানতে পারেনি। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি সরকার থেকেও তার ওপর কোনো চাপ দেওয়া হয়নি। তবে হ্যাঁ, ১৫০ জন অনুদান প্রদায়ীদের মধ্যে অনেকেই মেহতার সপ্তাহান্তিক কাগজে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ম করে তীব্র আক্রমণে অত্যন্ত আহত ও ক্ষুব্ধ বোধ করেছেনে। এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণই নেই যে দাতারা কিছুটা রক্ষণশীল ধারণার হবেনই। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন পরিষদ ভয় পাচ্ছে যদি অনুদান আটকে যায় বা কমতে থাকে তাহলে তো স্কলারশিপ বন্ধ করতে হবে? ছাত্রদের মাইনে বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের বেতন কমাতে হবে নতুন নতুন শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাগুলিকে বন্ধ রাখতে হবে। এত সবের পরেও কিন্তু কেউই সরাসরি মেহতাকে পদত্যাগ করতে বা তার লেখা বন্ধ করতে বলেননি। কিন্তু তাঁর এই সরাসরি বৈসাদৃশ্যমূলক আচরণের জন্য তিনি নিজেই ক্রমে উপলব্ধি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মসৃণ চলার পথে তিনি একটি দায় হয়ে উঠেছেন অনেকটা গমের কাঁটার মতো। এই ন্যায্য উপলব্ধির (যা তাঁর নিজের মতামত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার ফল) কারণেই তিনি নৈতিকভাবে ইস্তফা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে ধাওয়ানের মিশ্র প্রতিক্রিয়া, সত্যিকারের উদারনৈতিক মানুষ হিসেবে তিনি বিরোধিতার অধিকার অস্বীকার করেন না। তাই তাঁর দুঃখবোধ আছে। কিন্তু একটি সুস্থ সবল তিল তিল করে গড়ে তোলা মানসপুত্রকে বাঁচাতে পেরে তিনি আজ অনেকটাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভারতের এরকমই বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান চাই। অশোক আজ সৃষ্টিশীলতার সাগরে ভাসছে। কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে ধাওয়ান তা মেনে নিয়ে নিরীক্ষক নিয়োগ করেছেন। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখা হচ্ছে। এই যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অশোকা উঠে এল এতে তার উৎকর্ষ আরও বাড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

বিজেপির সংকল্পপত্রে সোনার বাঙ্গলা গঠনের প্রতিজ্ঞা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এতদিন পর্যন্ত কী পেল? তাহলে উত্তরটা এরকম দাঁড়াবে —'আমরা যে গাছটিকে কৃষ্ণচূড়া ভেবেছিলাম, যার উদ্দেশ্যে ধ্রুপদী বিন্যাসে কয়েক অনুচ্ছেদ প্রশস্তি লিখেছিলাম, গতকাল বলাইবাবু বললেন, 'ওইটি বাঁদরলাঠি গাছ'। ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যে অনেকটা চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছে এবং এক ভিন্নতর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আরবি শব্দ 'ইস্তেহারে'র ঊর্ধ্বে ভাবনাকে প্রসারিত করে ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যে 'সংকল্পপত্র' প্রকাশ করল। যা কেবল প্রচার না। প্রতিশ্রুতিও না। যা প্রতিজ্ঞা ও আত্মপ্রত্যয়। প্রকৃত সোনার বাঙ্গলা যদি গড়তে হয় যদি এখানে আরও একবার রচনা হয় 'জন্মভূমির প্রতি'র মতো কবিতা তাহলে এখানে কৃষি থেকে কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন থেকে নদী সংস্কার, নগরের আধুনিকীকরণ থেকে পরিবেশ সচেতনতা প্রতিটি আনাচে কানাচে সংস্কার করতে হবে। সোনার কাঠির জাদুস্পর্শে ধন্য হোক বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির জীবন। সংকল্পপত্রটি, এমন ভাবার কারণ নেই যে, এটি দপ্তরে বসেই লেখা হয়েছে। বাঙ্গলা জুড়ে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ কোটি কোটি মানুষের জনমতের ভিত্তিতেই এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সুচিন্তিত কর্ম যজ্ঞের প্রতিফলন এই সংকল্পপত্র। সুজলা সুফলা বাঙ্গলার কৃষকের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য প্রথম থেকেই বলা আছে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির আওতায় বর্ধিত আর্থিক সহায়তা হবে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা।

এছাড়াও এ রাজ্যের বঞ্চিত প্রায় ৭৫ লক্ষ কৃষক এককালীন বকেয়া ১৮ হাজার টাকা পাবেন। ভূমিহীন কৃষক ও ভাগচাষিরা বার্ষিক ৪ হাজার টাকা সহায়তা পাবেন। যাটোর্ধ্ব প্রত্যেক কৃষক ৩ হাজার টাকা পেনশন পাবেন। এই সংকল্পপত্র অঙ্গীকার করছে, কৃষক সুরক্ষা উদ্যোগ প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে। এর ফলে কৃষকসমাজ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়া ইউনিট গড়তে পারবে এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা সুদে ঋণ পাবে। কৃষক পরিবারের সার্বিক উন্নতিকল্পে স্বল্প, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সন্তানরা স্নাতক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। তাদের জন্য থাকবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা। সকল কৃষক কৃষিবিমার আওতাধীন হবেন এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বিষয়টি অতি সচেতনতার দৃষ্টিতে নিবন্ধ হয়েছে। এই বাবদ ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। টাস্কফোর্স গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ হবে মার্কেট ইন্টারভেনশন স্কিম, প্রাইম সাপোর্ট স্কিম, প্রাইম ডেফিসিয়েন্সি পেমেন্ট স্কিম। অর্থাৎ কৃষক সুরক্ষা যেন কোনো ভাবেই অবহেলার শিকার না হয় তা অতি তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৃষক মান্ডি থেকে কৃষকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সবই আছে সংকল্পের মধ্যে। কৃষির কথা বললেই আসে সেচের কথা। আগামী পাঁচ বছরে সারা রাজ্যে সেচ ব্যবস্থা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে বিজেপি। বাস্তবায়িত হবে প্রধানমন্ত্রী কুসুম স্কিল যার ফলে এই রাজ্যের কৃষকদের ৭.৫ হর্স পাওয়ার শক্তিসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত পাম্প বসানোর জন্য ৭৫ শতাংশ ভরতুকি দেওয়ার কথাও স্থির করা আছে। কার্যকরী হবে পিএম কৃষি সিঞ্চন যোজনা। ফলে অতি ক্ষুদ্র সেচ যোলো আনাই নিশ্চিত। চাষির উন্নতি হবে আর জেলের হবে না কেন? রাজ্যের সব মৎস্যজীবী জেলে সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। দুর্ঘটনা বিমায় সকলের জন্য থাকছে ৩ লক্ষ টাকার সুরক্ষা। এই প্রথম এ রাজ্যে 'জলে যাচ্ছে' ২ হাজার কোটি! মাছ চাষ আধুনিকীকরণে। ভুলে গেলে তো চলবে না মাছে-ভাতে বাঙ্গালি। দুগ্ধ শিল্পে আধুনিকীকরণ একান্ত দরকার। এই উদ্দেশ্যে

> **কলকাতা লন্ডন হবে এমন প্রতিজ্ঞা নেই কিন্তু কলকাতার উন্নতিকল্পে ২২ হাজার কোটি ব্যয় হবে। 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই' তখন কি বলতে পারব যখন বায়ু দূষণের জন্য সংকল্প মতো ১০টি স্মগ টাওয়ার বা পার্কিংয়ের জন্য ১০টি বহুতল বা ৩ হাজার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঝাঁ-চকচকে বাস চলবে?**

ব্যয় হবে ১ হাজার কোটি টাকা। গঠন হবে উন্নয়ন বোর্ড ও প্রক্রিয়া ইউনিট। করোনা লকডাউন এ রাজ্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল যে প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে কতোটা পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যার ফলে গ্যালন গ্যালন দুধ অপচয় হয়েছিল।

রাজ্যে পোলট্রি ব্যবসায় আগ্রহ প্রদান করাও এক বিশেষ উদ্দেশ্য এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করছে সংকল্পপত্র। এ রাজ্যে প্রতি এক লক্ষ মানুষের প্রতি মাত্র ২.৮৫ এম বি বি এস আসন। অঙ্গীকার এই যে, আগামী পাঁচ বছরে মেডিক্যাল ও নার্সিং আসন দ্বিগুণ করা। অনেকদিন ধরে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। সেখানে এবং জঙ্গলমহল, সুন্দরবনে এইমস গঠন প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যের সব মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আসবেন। আশাকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন— তাঁদের মাসিক সাম্মানিক ৬ হাজার করা হবে। এই বাঙ্গলার মেয়ে দেশের অহংকার ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তহবিলের (১০ হাজার কোটি টাকা) কথা কেবলমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্পেই লেখা থাকে। এ রাজ্যে শিক্ষিত যুবসমাজ বড্ড অসহায়। সারা দেশ বিশ্ব এ মুহূর্তে স্টার্ট অ্যাপে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ১০ হাজার স্টার্ট অ্যাপ চালু এবং ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকিযুক্ত লোন তার জন্য দেওয়া হবে। স্মার্ট ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, প্রতি ব্লকে নেতাজী ভোকেশনাল ট্রেনিং, ১০ হাজার কোটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তহবিলের মাধ্যমে ১০০টি নতুন সরকারি কলেজ এবং ৫০টি নতুন পলিটেকনিক কলেজ এমন অসংখ্য উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের দিশা রয়েছে এই প্রতিজ্ঞা পত্রে।

এ বাঙ্গলাকে বিনিয়োগ বান্ধব ভূমিতে উত্তীর্ণ করাই বিশেষ অঙ্গীকার। সে উদ্দেশে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাগুলিকে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ২ টাকা প্রতি ইউনিট মূল্যে বিদ্যুৎ ধার্যের কথাও উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হবে মেগা ও স্মল ফুড পার্ক। চা, আড্ডা আর বাঙ্গালি সমার্থক, তাই হিসেবে আছে চা পার্ক। চামড়া শিল্প উদ্যান থেকে লৌহ শিল্প উদ্যান সব দিকেই কড়া নজর এই সংকল্পপত্রের। বাদ যায়নি পাট শিল্প, যার পুনর্জীবন দরুন ১৫০০ কোটি বরাদ্দ। ভারতীয় জনতা পার্টির অঙ্গীকার, দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন এবং সকল কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত। এ রাজ্যের কয়লা মাফিয়া থেকে বালি চোর আর গোরু পাচারকারীর মহা দুর্দিনের কথা সংকল্পপত্র বলছে। রাজ্যে স্মার্ট ফেন্সিং করতেই হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশে ফুল স্টপ পড়তে চলেছে। এর জন্য থানাগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে। বাঙ্গলার সব বাড়িতে থাকুক পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, নিকাশি ব্যবস্থা, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত যা হবে নিঃশুল্ক, বিশুদ্ধ পানীয়জল, ঝাঁ-চকচকে সড়ক, শিলিগুড়ি কল্যাণীতেও ঝাঁ করে চলবে মেট্রো রেল, বাগডোগরা বিমানবন্দর হবে আন্তর্জাতিক মানের, মালদার গম্ভীরা শিল্পী মালদাতেই উড়োজাহাজে উঠবেন, পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা এবার ওই জেলাতেই প্লেনে উঠবে। ঢ্যারঢ্যারে বাসে আর চড়বে না বাঙ্গালি। ১০ হাজার কোটি ব্যয় হবে বাস 'জোরে' করতে! এই সংকল্পপত্র নজর দিচ্ছে মতুয়া দলপতির মাসিক ৩ হাজার টাকা পেনশন থেকে শরণার্থী পরিবারকে পাঁচ বছরের ১০ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক সুবিধা দেওয়ায়। বাদ যায়নি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। তাদের জন্য মাসে মাসে পেনশন (৩ হাজার), প্রবীণ অটো এবং ট্যাক্সি চালকেরাও মাসিক ৩ এবং ৫ হাজার টাকা পেনশন পাবেন। দাদু ঠাম্মার মাসিক ১ হাজার ভাতা বেড়ে হবে ৩ হাজার। দিব্যাঙ্গদের জন্যও তাই। পুরোহিতদের এবং ষাটোর্ধ্ব কীর্তনীয়াদের জন্যও একই সাম্মানিক। রাজ্য জুড়ে অন্নপূর্ণা ক্যান্টিনে পাঁচ টাকায় খাওয়া।

পিডিএস সুবিধাভোগীরা ভরতুকিযুক্ত রেশন পাবেন। এসবের মাঝে নিগূঢ় থাকছে কর্মসংস্থান। কলকাতা লন্ডন হবে এমন প্রতিজ্ঞা নেই কিন্তু কলকাতার উন্নতিকল্পে ২২ হাজার কোটি ব্যয় হবে। 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই' তখন কি বলতে পারব যখন বায়ু দূষণের জন্য সংকল্প মতো ১০টি স্মগ টাওয়ার বা পার্কিংয়ের জন্য ১০টি বহুতল বা ৩ হাজার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঝাঁ-চকচকে বাস চলবে? বাঙ্গলার পর্যটন থেকে আঞ্চলিক চা-বাগানের উন্নয়ন কিচ্ছুটি কিন্তু নজর এড়ায়নি। এবার চা-বাগানের ওই নিপুণ আঙুলের মজুরি এক ধাক্কায় বেড়ে হবে দৈনিক ৩৫০। ১১টি ভারতীয় গোর্খা উপজাতি অন্তর্ভুক্ত হবে তফশিলির তালিকায়। বাঙ্গালি হিসেবে গর্বিত হই যখন সংকল্প নেওয়া হয় বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। পরিশেষে বলতেই হবে, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিজেপির সংকল্পের কথা। এই বিষয়টিকে বিগতদিনে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের লিখিত ম্যানিফেস্টোতে রাখেনি। অনগ্রসর পরিবারে কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে থাকবে ৫০ হাজার টাকার বন্ড। সেই কন্যা যখন দ্বাদশ উত্তীর্ণা এবং অবিবাহিতা তিনি পাবেন ২ লক্ষ টাকা। এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত নানান স্তরে আর্থিক সহায়তা, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ। বিয়ের সময় (১৮ বছর) অনগ্রসর পরিবারের মেয়েটি এক লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট পাবেন। সরকারি সব চাকরিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ। জোরদার হবে মহিলা স্ব-নির্ভরগোষ্ঠী। ব্লক থেকে সরকারি অফিস বরাত পাবে বাঙ্গলার মেয়েরাই। মাতৃকালীন ভাতা এবার ৯ হাজার এবং বিধবা ভাতা ৩ হাজারের প্রতিশ্রুতি এবং নারী সুরক্ষার্থে ন'টি মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়নের প্রতিজ্ঞা। সংকল্পপত্র সারা বাঙ্গলা পরিভ্রমণ করেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরাও যেন বাঙ্গলাকে চিনতে পারি সে সংকল্পও আছে। ভোটের শেষে নতুন সরকার গঠন হবে, আমরা তারপর বেড়াতে যাবো সংকল্পমতো সংস্কার করা আজকের জরাজীর্ণ বৌদ্ধ বিহারগুলিতে। ইকো ট্যুরিজমের আনন্দ নেব চুটিয়ে। রাজবংশী ট্যুরিজম সার্কিট নাকি ১৩টা শক্তিপীঠ কার কোনটা প্রথম পছন্দ জানি না। তবে সে যাই হোক, সোনার বাঙ্গলা নির্মাণের মাহেন্দ্রক্ষণ যে উপস্থিত— সে কথা বলাই যায়।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গবেষক)

ফ: ২

মমতার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বনাম রাজ্যবাসীর প্রাপ্তি

হীরক কর

'বাঙ্গলা নিজের মেয়েকেই চায়', এখন এই হোর্ডিং-এ ছেয়ে গেছে কালিম্পং-এর পাহাড় থেকে পুরুলিয়ার টাড়। কিন্তু আদৌ কি বাঙ্গলা নিজের মেয়েকে চায়? বাঙ্গলার নিজের মেয়ে কি গত দশ বছরে তাঁর বাবা-কাকা, মা-ঠাকুমাকে দেওয়া কথা রাখতে পেরেছেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার খতিয়ে দেখলেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তেহার অনুযায়ী, স্বাস্থ্য বিভাগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা হবে মা-মাটি- মানুষের সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। তৃণমূলের খতিয়ান অনুযায়ী, প্রসূতি মৃত্যুর হার যথাসম্ভব কমানোর প্রচেষ্টা করা হবে। তাই উন্নত চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছে তৃণমূল সরকার। ২০১৬ সালের ইস্তাহার বলছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি হারপাতালে সবার জন্য অন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকী, সরকারি হাসপাতালগুলিতে সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে। মহকুমা স্তরেও আইসিইউ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১১ সাল থেকে মাত্র সাড়ে ৪ বছরে ১০৯টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে। যেখান থেকে বিভিন্ন ওষুধের দামে ৪৮ শতাংশ থেকে ৭৭.২ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সস্তায় ডায়েলেসিস, গ্রামে গ্রামে সিসিইউ, আইসিইউ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৪১টি মাল্টিসুপার হাসপাতাল করা হয়েছে এবং হোমিওপ্যাথি, যোগাসন ও নেচারোপ্যাথিকে জনপ্রিয় করতে রাজ্য স্তরে পৃথক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যবস্থা তো অনেকেই রয়েছে। পুরুলিয়ার মালতী মুর্মু থেকে কলকাতার কৌশিক সরকাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেন না কেন? তাই হয়তো, স্বাস্থ্য খাতে ইস্তাহারে এই পরিসংখ্যানের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলো। বিরোধীদের কথায়, রাজ্যে স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ শোচনীয়। হাসপাতাল থাকলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সরকারি হাসপাতালগুলোতে দুর্নীতি ভরে যাওয়ায় সাধারণ মানুষেরা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না। বারবার কলকাতা

মেডিক্যাল কলেজে শিশু বিভাগে শিশুমৃত্যু ঘটনার উদাহরণ তুলে তৃণমূল সরকারের ইস্তাহারের সমালোচনা করতে ছাড়েনি বিরোধী পক্ষ। গ্রামেগঞ্জে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও কম নয় রাজ্যে। এমনকী, সেই সময় সরকারের কৃমিনাশক কর্মসূচির ফলেও অসুস্থ হয়েছিল বহু শিশু। বিরোধীরা সেই দিকেই আঙুল তুলেছেন বার বার।

নগরোন্নয়নের ব্যাপারে সৌন্দর্যায়নকেই বেশিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ২০১৬-র ইস্তেহারে। শহরে ইকো ট্যুরিজম, নতুন পার্ক, আলোর ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সঙ্গে রাস্তার প্রসার, জল প্রকল্প, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, গীতাঞ্জলি ও নজরুল মঞ্চের সংস্কারের কথাও বলা হয়েছিল। শহরে নতুন উড়ালপুল, যেমন পরমা, কামালগাজি ৪ লেন উড়ালপুলের কথা বলা হয়েছিল। সেগুলো হয়েছে। কয়েকটি উড়ালপুল ত্রুটিপূর্ণ বলে ভেঙে পড়েছিল। নতুন করে করতে হয়েছে উলটোডাঙা উড়ালপুলের একাংশ।

কল্যাণী, শান্তিনিকেতন, বারুইপুর, আসানসোলকে সমৃদ্ধ সিটি এবং হাওড়ায় স্পোর্টস সিটির সঙ্গে শিলিগুড়িতে তিস্তা সিটি গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছিল। নগরোন্নয়নের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল পরিবহণকেও। অণ্ডালে নতুন বিমান বন্দর, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, গঙ্গাসগর, দীঘা হেলিকপ্টার সার্ভিস, শহরের রাস্তায় এসি বাসের কথাও বলা হয়েছিল। ইস্তেহারে বাদ পড়েনি বিদ্যুৎ সরবরাহের কথাও, বাঙ্গলায় 'লোড শেডিং নেই', 'সবার ঘরে আলো' এই ধরনের মন্তব্য করেই ইস্তাহারে বাঙ্গলার নগরোন্নয়নকে তুলে ধরেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কিন্তু, আজও দার্জিলিং, কালিম্পং, পুরুলিয়ার মতো জেলায় দিনে নিয়ম করে তিন চার ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে যায়। অভাব দেখা যায় জলের। নাজেহাল হন ওইসব এলাকার বাসিন্দারা।

বিরোধীরা অল্প কথায় জানিয়েছেন, ইস্তেহারের পাতায় থাকা এই বিষয়গুলো বাস্তবে মরীচিকা। এদের উপস্থিতি থেকেও নেই। এমনকী, কলকাতার রাস্তায় সারা রাত বাস চলার ব্যাপারেও, বার বার নতুন নতুন ঘোষণা হলেও বাস দেখাই যায় না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পথ দুর্ঘটনার হার প্রচুর। বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা বেহাল, নিকাশি ব্যবস্থাও বেশ দুর্বল। একটু বৃষ্টি হলেই কলকাতার মতো মেট্রো সিটির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে। আমফানের মতো ঝড়ে গাছ পড়লে তা সরাতে মাস পেরিয়ে যায়। বিরোধীদের প্রশ্ন,এটাই কি নগরোন্নয়ন?

তৃণমূল সুপ্রিমো ২০১৬-র ইস্তেহারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন কৃষিতে। মা-মাটি-মানুষের কথা মাথায় রেখে ইস্তেহারে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নকেই তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী। ইস্তেহার অনুযায়ী, খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎকর্ষের জন্য আমাদের রাজ্য পরপর চারবার ভারত সরকারের 'কৃষিকর্মণ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইস্তেহার অনুযায়ী কৃষকদের পারিবারিক আয়ও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার পিছু বার্ষিক আয় ২০১০-১১ সালে ছিল মাত্র ৯৩ হাজার টাকা, ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ইস্তেহারে উল্লেখ করা হয়, মাত্র সাড়ে ৪ বছরে তৃণমূল সরকার ৬৯ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতে 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' তুলে দিয়েছে। রাজ্যে ১৭৬টি কৃষক বাজার গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ১২১টিরও বেশি কৃষক বাজারের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় সেই কৃষক বাজার ফাঁকা। গঞ্জ থেকে দূরে হওয়ায় সেখানে যেতে চান না অধিকাংশ কৃষকই।

ওই ইস্তেহার অনুযায়ী, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ৮১০টি বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য চাষ শুরু হয়েছে। ১.৩৮ লক্ষ মৎস্যচাষিকে বায়োমেট্রিক কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য জেলায় জেলায় কৃষি ভবন তৈরি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন শিল্প করার জন্য কৃষকদের থেকে জমি নেওয়ার ঘটনায়। বিরোধীদের সোজাসাপটা প্রশ্ন, তৃণমূল সরকার একদিকে কৃষির উন্নতি চাইছে, অন্যদিকে শিল্প গড়ার জন্য কৃষকদের থেকে জমি নেওয়ার কথা বলছে। শালবনি ও সিঙ্গুরের প্রশ্ন তুলে কৃষিক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের পরিসংখ্যানকে সমালোচনায় বিঁধছেন বিরোধী দলের নেতারা।

জঙ্গলমহল, পাহাড় ও চা বাগান। জঙ্গলমহল, পাহাড় এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির উগ্র চর্চার কেন্দ্র। ২০১৬-র ইস্তেহারে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শান্তি ফিরেছে পাহাড়ে। জঙ্গলমহল আজ শান্ত। মাও রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে জঙ্গলমহলে এখন শান্তির হাওয়া। জঙ্গলমহল হাসছে। আর এর পুরোটাই তৃণমূল সরকারের জন্য। ইস্তেহারে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৬, সাড়ে চার বছরে জঙ্গলমহলে উন্নয়নের কাজ এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের মোট ২৪টি ব্লকের মানুষ; পশ্চিম মেদিনীপুরে ১১টি, পুরুলিয়ায় ৯টি ও বাঁকুড়া জেলার ৪টি জঙ্গলমহল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫ সালে বীরভূম জেলার ১০টিব্লকও এর আওতায় এসেছে। ওই ইস্তেহার অনুযায়ী, এই এলাকার মানুষের সরকারি কাজের সুবিধা এবং প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামকে একটি পৃথক জেলা এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ও মানবাজার ব্লককে ২টি পৃথক মহকুমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জঙ্গলমহল এলাকার মূল সমস্যা হলো ভূপ্রকৃতিগত কারণে মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা কম। তাই, এই এলাকায় জলতীর্থ প্রকল্প তৈরি করার কথাও ভাবা হয়। চা-বাগানের সমস্যা সমাধানে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছে সরকার। প্রকল্প

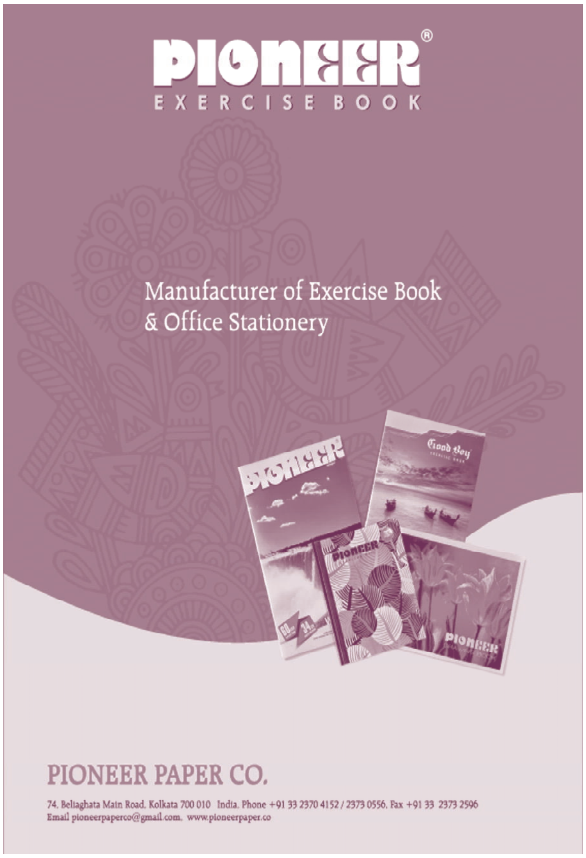

অনুযায়ী, চা-বাগান বন্ধ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। এই ভাতা নিয়ে রাজনৈতিক দুর্নীতির কথা ফিসফিসিয়ে শোনা যায় ডুয়ার্সের চা-বাগানের অন্দরমহল।

চ-বাগানগুলো থেকে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মেডিক্যাল ইউনিট, উন্নতমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পেনশন, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুনিশ্চিত করার উদ্যোগে তৃণমূল সরকার বদ্ধপরিকর। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, সবই প্রকল্প ও পরিকল্পনায় আটকে। আজও চা-বাগানে পরিস্থিতি ঠিক হয়নি। একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হওয়ার বিপর্যস্ত চা-বাগানের শ্রমিকেরা। অপুষ্টি, মৃত্যুর হার প্রচুর। শ্রমিক আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তেহারে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্তেহার অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন, তাঁদের কর্মসংস্থানে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ দপ্তর গঠনের কথা বলা হয়। যদিও সে দপ্তর বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ছিল। বিশেষ করে নজর দেওয়া হয় সংখ্যালঘু স্কলারশিপ ও ঋণের উপর। ইস্তেহার অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের স্ব-রোজগারের জন্য ৭০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশে ১ নম্বর স্থানে। সংখ্যালঘুদের সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বাজেটে বরাদ্দ ৪৭২ কোটি টাকা থেকে বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৮৩ কোটি টাকা হয়েছে। ইস্তেহার অনুযায়ী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২৯১ জন ডাক্তারিতে, ২৫ জন ডব্লিউবিসিএস-এ এবং ৯ জন ওয়েস্টবেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিসে সফল হয়েছেন। সংখ্যালঘু মানুষকে উচ্চশিক্ষার দিকে নিয়ে যেতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে কাজও শেষ হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গত সতেরো মার্চ ইস্তেহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন আগে প্রকাশিত ইস্তেহারের ১০০ শতাংশের মধ্যে ১১০ শতাংশ কাজ হয়েছে। এর আগে ২০১১ এবং ২০১৬ সালে, দুবার তৃণমূল ইস্তেহার প্রকাশ করেছে বলে তৃণমূল সুপ্রিমো নিজেই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সরকারের অনেকগুলো কাজ বিশ্বে একনম্বরে। সবুজসাথী রাষ্ট্রসঙ্ঘের পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু সবুজসাথীর মতো ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার করেছে।

আবার ১০০ দিনের কাজে রাজ্য একনম্বরে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, রাজ্যে সব থেকে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে। ৪০ শতাংশ বেকারি কমেছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে।

তৃণমূলের এই ইস্তেহারে আসন্ন নির্বাচনের আগে 'দিদির ১০ অঙ্গীকার' বলে ১০টি নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের সাফল্য ও লক্ষ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য তৃণমূল নেতারা এখন নিয়মিত তাঁদের বক্তৃতায় এই সব অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঘুরে বেড়াচ্ছে দিদির ১০ অঙ্গীকার হ্যাশট্যাগ। তবে শাসক দলের এই ইস্তেহার নিয়ে প্রশ্নও উঠে গেছে ইতিমধ্যেই।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল যে ইস্তেহার প্রকাশ করেছিল, তা ছিল ১৪৬ পৃষ্ঠার একটি বিশাল নথি। আর ২০২১ সালে যে ইস্তেহার তারা প্রকাশ করেছে, তা মাত্র ৫০ পাতার ঝকঝকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক এক ইস্তেহার। অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় এবং সুরক্ষা, যুব, খাদ্য, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, রাস্তা, জল দিদির ১০ অঙ্গীকার বলে এই ১০টি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইস্তেহারটির পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর বা 'টিম পিকে'-র কৌশলী ছাপ স্পষ্ট। তাই এটা দিদির ১০ অঙ্গীকার, না প্রশান্ত কিশোরের কাল্পনিক অঙ্গীকার, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই ইস্তেহারে একেবারে আলাদা আলাদা করে নির্দিষ্ট ভোটার গোষ্ঠীগুলোকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে? এসসি-এসটিদের জন্য ন্যূনতম আয়, দরিদ্রদের জন্য দুয়ারে রেশন বিতরণ,

শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি হিন্দু উপজাতি সম্প্রদায়কে ওবিসি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে বিভাজনের উদ্দেশ্য একেবারে স্পষ্ট। প্রশ্ন উঠেছে, এরপর কি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। আসছে না সাম্প্রদায়িকতার কালো ছায়া।

তবে, বাস্তবে এই প্রতিটি শ্রেণীর ভোটারই গত কয়েক বছরে স্থানীয় নেতাদের দুর্নীতি ও একচেটিয়া দলীয় নীতির শিকার হয়েছেন। এখন এইসব প্রতিশ্রুতির ওপর কি তারা ভরসা রাখতে পারবেন?

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের ইস্তেহারে কর্মসংস্থান নিয়ে নির্দিষ্ট বিভাগ ছিল। এইবার ২০২১-এ কিন্তু রাজ্যে কর্মসংস্থান নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও উল্লেখ নেই ইস্তেহারে। বদলে বিভিন্ন অংশে ইঙ্গিত রয়েছে কর্মসংস্থনের। পরবর্তী ৫ বছরে বার্ষিক ৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, আগের তিনটি ইস্তেহার অনুযায়ী যদি ১১০ শতাংশ কাজ হয়েই থাকে তাহলে এই পাঁচ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন কী?

যদিও এবারের ইস্তেহারে আগামী ৩ বছরে বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদ পূরণ কীভাবে হবে তার কোনও দিশা নেই। তাহলে কি এই অক্ষমতা ঢাকতেই তুলে দেওয়া হলো ইস্তেহারের কর্মসংস্থান বিভাগটি?

২০১৯ সালের ইস্তেহারে 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন' নিয়ে আলাদা পরিচ্ছেদ ছিল। এবার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই পরিচ্ছেদও। এইবারের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে বিষয়টি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়তে হচ্ছে, তা হলো 'মুসলমান তোষণে'র অভিযোগ। এক সময় তাঁকে সমর্থন করলেও এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দুই পিরজাদা। আব্বাস সিদ্দিকি ও ত্বহা সিদ্দিকি। তাদের বক্তব্য, গত ১০ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কথা বলেছেন। বাস্তবে মুসলমানরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। আব্বাস সিদ্দিকি বাম কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংযুক্ত মোর্চায় যুক্ত হয়েছেন। হঠাৎ করেই ত্বহা সিদ্দিকির মনে হয়েছে দিদিই আসল ধর্মনিরপেক্ষ। দিদির বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লব করার পর ত্বহা এখন তৃণমূলের সঙ্গে। 'মুসলমান তোষণে'র অভিযোগের বিষয়টি ইস্তেহারের বদল থেকেও স্পষ্ট। তাহলে কি বিজেপির আক্রমণে হুইল চেয়ারে বসা মমতা ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হয়েছেন?

ইস্তেহারে শিল্প বিভাগে তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আগামী ৫ বছরে রাজ্যে ২০০০ বড়ো শিল্প ইউনিট তৈরি হবে। কীভাবে তা হবে, তা অবশ্য কেউ জানে না। এই নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। প্রতিবছর শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে ঘটা করে শিল্প সম্মেলন হয় পশ্চিমবঙ্গে। কখনো শিলিগুড়িতে, কখনো কলকাতায়। কিন্তু সেই সম্মেলন থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য বড়ো শিল্প গড়ে উঠেছে, এমনটা কেউই মনে করে উঠতে পারবেন না। কাজেই পরের ৫ বছরে কীভাবে বড়ো শিল্প গড়ে উঠবে রাজ্যে সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই লড়ছেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী তৃণমূলেরই প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের স্বার্থেই হয়তো প্রথমবার আলাদা করে নন্দীগ্রামের জায়গা হয়েছে তৃণমূলের ইস্তেহারে। নন্দীগ্রামকে একটি মডেল শহরে পরিণত করতে চায় তৃণমূল সরকার। এমনই এক বিশেষ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ইস্তেহারে। প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, গত ১০ বছরে তা হয়নি কেন? শুভেন্দু অধিকারীর কথা মতো, দিদি কি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন নন্দীগ্রামকে? তাই সব ভুলে নন্দীগ্রামের মানুষ নিজেদের ঘরের ছেলেকে না চেয়ে কি বাঙ্গলার মেয়েকে চাইবেন?

ভোটের আগে সুশাসনকে তুলে ধরতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চালু করেছে 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান'-এর মতো দুটি সরকারি প্রকল্প। দুটিই প্রশান্ত কিশোরেরই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে শোনা যায়। বস্তুত, তিনি মমতাকে ভোট বৈতরণী পার করানোর দায়িত্ব নেওয়ার পরই, গত বছরের শেষে এই দুটি প্রকল্প চালু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রকল্প এখন বছরে দু'বার করে করা হবে, বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবারে দিদির ইস্তেহারে। এছাড়া, শহুরে দরিদ্রদের জন্য ভরতুকিকৃত রান্না করা খাবার সরবরাহের সাম্প্রতিকতম প্রকল্প 'মা ক্যান্টিন'-এর সংখ্যাও রাজ্যের ৫০টি শহরে ২,৫০০ ক্যান্টিন স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। শেষ লগ্নে চালু করা এইসব প্রকল্পে জোর দেওয়া, গভীর জলে হাবুডুবু খেয়ে বাঁচর চেষ্টায় শামিল হওয়ার মাত্র।

২০১৯-এর নির্বাচনী ইস্তেহারে জঙ্গলমহল, পাহাড় ও চা-বাগান এলাকা নিয়ে পৃথক অধ্যায় ছিল। এই বছর এই অংশকে রাখা হয়েছে 'সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুরক্ষা'-র অধীনে। চা-বাগানের উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু পাহাড় নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ নেই। বিমল গুরুংকে ফিরিয়ে আনার পর কী পাহাড়ের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সংশয়ে তৃণমূলই? কারণ দার্জিলিংয়ের তাকদার সরাইখানার মালিক সুনীতা রাই বলেই দিয়েছিলেন, 'গুরুংকে রাজনীতি করতে হবে সমতলেই। তার পাহাড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। আমরা মানি বিনয় তামাংকেই'। ফলে পাহাড় এই মুহূর্তে হাসছে কিনা জানেন না তৃণমূলের নেতারাই।

জঙ্গলমহল নিয়েও তৃতীয় তৃণমূল সরকারের ভাবনার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং এবার তৃণমূলের হার-জিৎ নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন জঙ্গলমহলের বাসিন্দারা। বান্দোয়ানের বলরাম মাহাতোর কথায়, 'উহারাই তো ছিল মাওবাদী। এখন তৃণমূল হুইছে। পঞ্চায়েতের চাল লুট করছে। তৃণমূল হেইরা গেলি উহারা আবার মাওবাদী হুই যাবেক। সন্ত্রাস, উৎপাত বাড়বেক'। অর্থাৎ, বাস্তবে মাওবাদী সমস্যার সমাধান হয়নি। সেই আগুন জ্বলছে 'ক্ষোভ' নামক খড়ের গাদার তলায় ধিকি ধিকি। তাই জঙ্গল মহল নিয়ে শাসকদলের ইস্তেহারে 'স্পিকটি নট'। এরপরেও কি বাঙ্গলা দিদিকেই চায়? ◻

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারত বিশ্বের কল্যাণে নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবে

প্রতিবছরের মতো এবারও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক গত ১৯, ২০ মার্চ সম্পন্ন হয় ব্যাঙ্গালুরুতে। করোনা মহামারীর সাবধানতায় ১৫০০ প্রতিনিধির স্থলে মাত্র ৪৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। বাকিরা নিজ নিজ প্রান্তকেন্দ্রে থেকে অনলাইন বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এবারের বৈঠকে উল্লেখযোগ্য হলো সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে সরকার্যবাহ নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যতম সহ-সরকার্যবাহ ড. মনমোহন বৈদ্য জানান, করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সঙ্ঘের সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকা সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় ছিলেন। করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষের সহায়তার জন্য প্রথমদিন থেকেই তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো ওয়েল ফেয়ার স্টেট হওয়ার জন্য সরকারি মেশিনারিই শুধু সক্রিয় ছিল, কিন্তু ভারতের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সরকার ও প্রশাসনের সেবাকাজের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সমাজও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বন্যা ও ভূমিকম্পের সময় সেবা করা আলাদা বিষয় কিন্তু করোনাকালে সংক্রমণের বিপদ সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকরা বৃহৎ সংখ্যায় সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে। সারা দেশে স্বয়ংসেবকরা সেবা ভারতীর মাধ্যমে ৯২ হাজার ৬৫৬ স্থানে সেবাকাজ করেন। ৫ লক্ষ ৬০ হাজার স্বয়ংসেবক দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৩ লক্ষ রেশনকিট, ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে ভোজন প্যাকেট দান, ৯০ লক্ষ মাস্ক বিতরণ, ২০ লক্ষ প্রবাসী মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, ২ লক্ষ ৫০ হাজার যাযাবর মানুষকে সহায়তা প্রদান, ৬০ হাজার ইউনিট রক্ত দান প্রভৃতি কাজ করেন। কেবল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই নয়, বহু সংগঠন, মঠ-মন্দির, গুরুদ্বারাও সমজের মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে আসে। তিনি আরও জানান, গত বছর মার্চের তুলনায় ৮৯ শতাংশ শাখা পুনরায় শুরু

হয়েছে। দেশের সমস্ত জেলার সঙ্ঘকাজ রয়েছে। সারা দেশে ৬৪৯৫ খণ্ডে ৮৫ শতাংশে শাখা রয়েছে। ৫৮ হাজার ৫০০ মণ্ডলের ৪০ শতাংশে প্রত্যক্ষ শাখা রয়েছে। আগামী তিন বছরের সমস্ত মণ্ডলে সঙ্ঘকাজ শুরু হবে আশা করা হচ্ছে।

রামমন্দির নির্মাণের জন্য স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে নিধি সংগ্রহ করা ছিল না, সারা দেশে আধিকারিক গ্রামে, পরিবারে সম্পর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল। সারা দেশে ২০ লক্ষ স্বয়ংসেবক ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৩৭ স্থানে ১২ কোটি ৪৭ লক্ষ ২১ হাজার পরিবারে সম্পর্ক করেন। এবারের বৈঠক দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) শ্রীরাম জন্মভূমিতে মন্দিরের নির্মাণ : ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ

শ্রীরাম জন্মভূমি বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সর্বসম্মতিক্রমে প্রদত্ত রায়, তারপরে শ্রীরাম মন্দির নির্মাণের জন্য সর্বজনীন ন্যাস 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র' গঠন, অযোধ্যায় সুরম্য মন্দির নির্মাণ কার্যের শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান এবং নিধি সমর্পণ অভিযান ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষর খচিত একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে--- যা আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সুচিন্তিত মত যে, উপরোক্ত কার্যক্রমগুলির দ্বারা ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ঘটেছে এবং এই কার্যক্রম আধ্যাত্মিক জাগরণ, রাষ্ট্রীয় একাত্মতা এবং সামাজিক সমরসতা, সদ্ভাব ও সমর্পণের অদ্বিতীয় প্রতীক রূপে জনমানসে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নবনির্বাচিত সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।

৫১২২ কলিযুগাব্দের মুখ্য চান্দ্র ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে (৫ আগস্ট ২০২০) যখন মন্দির নির্মাণের শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভব্য কার্যক্রমকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক, শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের অছি পরিষদের সদস্য এবং ভারতের সমস্ত মত-পন্থের পূজ্যপাদ ধর্মাচার্যগণের গরিমাময় উপস্থিতি শোভিত করেছে, তখন সম্পূর্ণ বিশ্ব এই মুহূর্তের সাক্ষী থেকে ভাববিভোর হয়েছে।

ভারতের সমস্ত তীর্থের পবিত্র ধূলিকণা এবং সমস্ত পবিত্র নদীর জলের দ্বারা এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। করোনা মহামারীর ভীষণতার সময়ে এই কার্যক্রম সমস্ত মর্যাদা পালন করে সীমিত সংখ্যার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই কার্যক্রমের প্রভাব অসীম। প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সীমিত থাকলেও বিভিন্ন সম্প্রচার মাধ্যমে সমস্ত হিন্দু সমাজ এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। সমাজের সমস্ত বর্গ ও রাজনৈতিক দল একমত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে।

মকর সংক্রান্তির পবিত্র দিনে ভারতের প্রথম নাগরিক মহামহিম রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিধি সমর্পণ ও দিল্লিতে অবস্থিত ভগবান বাল্মীকি মন্দির থেকে শুরু হওয়া ৪৪ দিন যাবৎ চলতে থাকা অভিযান বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সম্পর্ক অভিযান রূপে প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষের অধিক শহর ও গ্রামে প্রায় ১২ কোটির অধিক রামভক্ত পরিবার এই সুরম্য মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সমর্পণ করেছেন। সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও মত-পন্থের মানুষ এই অভিযানে নিজ প্রেরণায় অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রামবাসী-শহরবাসী থেকে শুরু করে বনবাসী-গিরিবাসী বন্ধু পর্যন্ত, ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এই অভিযানের সাফল্যে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছেন। এই অদ্বিতীয় উৎসাহ এবং অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধি সভা সমস্ত রামভক্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই অভিযানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে যে সম্পূর্ণ দেশের আবেগ সর্বদাই শ্রীরামময় হয়ে রয়েছে। প্রতিনিধি সভা দেশের সমস্ত সামাজিক ধর্মীয় সংস্থা, শিক্ষাবিদ, প্রবুদ্ধ শ্রেণী-সহ সমস্ত রামভক্তকে আহ্বান জানায় যে, আপনারা শ্রীরামের আদর্শসমূহ সমাজে সঞ্চারিত করার জন্য সার্থক প্রয়াস করুন। অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমিতে সুরম্য মন্দির

নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সামুহিক সংকল্প ও প্রযত্নের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জীবন মূল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ভিত্তিতেই বৈভবসম্পন্ন সমর্থ ভারত নির্মাণের পথ প্রশস্ত হবে। তার দ্বারাই ভারত বিশ্বের কল্যাণে নিজের ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করবে।

(২) কোভিড মহামারীর মোকাবিলায় সংগঠিত ভারত

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বিশ্বময় মহামারী কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় বিষয়ে ভারতীয় সমাজের উল্লেখযোগ্য, সম্মলিত ও সামগ্রিক প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং এর ভীষণ পরিণামকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী কর্তৃক পালিত ভূমিকার জন্য তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

মহামারী ও তার ভয়ংকর পরিণামের খবর আসা শুরু হওয়া মাত্রই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়েছে। জনসাধারণকে এই রোগের লক্ষণ এবং তার থেকে বাঁচার উপায় সম্বন্ধে জানানোর জন্য সমগ্র দেশে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল উপকরণ ও মিডিয়ার ইতিবাচক সহযোগের ফলে এক বৃহৎ জনজাগরণের কাজ হয়েছে।

ফলস্বরূপ পুরো দেশ সংগঠিত ভাবে বিধিনিষেধ পালন করেছে এবং শুরুর সময়ে যে বিভীষিকার অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। করোনা পরীক্ষা এবং রোগীদের সেবার কাজে সংশ্লিষ্ট সমস্ত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বচ্ছতাকর্মী চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেছেন এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। সমাজে অনেক শ্রেণী যেমন— নিরাপত্তা কর্মী, সরকারি কর্মী, জরুরি পরিষেবা এবং আর্থিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীবর্গের সঙ্গে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অনেক মানুষের সক্রিয়তার কারণে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ নির্দ্বিবাদে চলতে থেকেছে।

এই সমস্ত কাজ এবং বিভিন্ন সরকারি বিভাগের সংযুক্ত প্রয়াস যেমন— 'শ্রমিক এক্সপ্রেস', 'বন্দে ভারত মিশন' এবং বর্তমানে চলতে থাকা 'কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি' ইত্যাদি অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।

বৈশ্বিক মহামারীর সঙ্গে সংগ্রামরত নিঃস্বার্থ ভাবে কর্তব্য পালন করতে থাকা অনেক করোনা যোদ্ধা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সেই সব যোদ্ধার সাহস ও বলিদানকে স্মরণ করে হৃদয় থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছে। এই সময়ে মহামারীর কারণে সহস্রাধিক মানুষ কালের করাল গ্রাসে চলে গিয়েছেন। সেই সমস্ত স্বর্গত মানুষের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

ভারতের সম্পূর্ণ সমাজ এই অনভিপ্রেত ঘটনাচক্রে পীড়িত কোটি কোটি মানুষকে খাদ্যসামগ্রী, রান্না করা খাবার, চিকিৎসা পরিসেবা, যাতায়াত, আর্থিক সহায়তা প্রভৃতির দ্বারা সেবা দিয়ে আত্মীয়তা ও সামাজিক একতার নতুন উদাহরণ স্থাপন করেছে। বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ পীড়িত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়েছেন। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এই সমস্ত সংস্থা ও ব্যক্তিদের তাদের নিঃস্বার্থ ও আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছে।

কোভিড-এর প্রকোপ এবং তার পরে লকডাউনের কঠিন পরিস্থিতির সময়ে প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একটি বৃহৎ শ্রেণীকে অনেক সংকট ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজ অত্যন্ত ধৈর্য ও অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়ে বিষম ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। চিকিৎসা সুবিধার অপর্যাপ্ততা এবং শহর থেকে পলায়নের কারণে নানা সমস্ত সমস্যার অনুমান সত্ত্বেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল। বাস্তবিকতা হলো, স্থানীয় নিবাসীরা শহর থেকে আগত মানুষদের দেখাশুনার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা যথার্থই প্রশংসার যোগ্য। এই সময়ে কৃষি উৎপাদন অন্য সময়ের তুলনায় বেশি হয়েছে এবং শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়েও উৎসাহজনক স্থিতি দেখা যাচ্ছে। ভেন্টিলেটর, পিপিই কিট, করোনা পরীক্ষার কিট এবং দ্রুত ও সস্তা স্বদেশি করোনা ভ্যাকসিনের আবিষ্কার এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং শিল্পে উদ্ভাবনী প্রয়োগের সাহায্যে আমরা এই আপাতকালীন পরিস্থিতিকেও সুযোগ পরিণত করতে সক্ষম হয়েছি। এই কঠিন সময়ে সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং প্রতিভা প্রকাশের অবসরপ্রাপ্ত হয়েছে। এই বৈশ্বিক সংকটের সময়ে ভারত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'- এর পরম্পরা অনুসারে শুরু থেকেই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ও অন্য অত্যাবশ্যক পণ্য রপ্তানি এবং 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' অভিযান দ্বারা বিশ্বের অনেক দেশকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বিশ্বের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও দেশ ভারতের এই সময়োচিত সহযোগিতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে।

এই মহামারীতে আমরা আমাদের সামগ্রিক বৈশ্বিক দৃষ্টি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পরম্পরা এবং বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার শক্তি ও সামর্থ্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। পরম্পরানুসারী মূল্যবোধ অনুসারে আমাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার, পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়, সংযত উপভোগের মাধ্যমে সুস্থ জীবনশৈলী, পারম্পরিক ভোজন পদ্ধতি এবং ঔষধি সমূহের সেবনের মাধ্যমে প্রতিরোধক ক্ষমতার বৃদ্ধি ও রোগের প্রতিরোধ, যোগ ও ধ্যানের ইতিবাচক পরিণাম প্রভৃতি এই সময়ে উপলব্ধি করা গিয়েছে। বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞ ভারতের এই একাত্ম দৃষ্টি এবং তার উপর ভিত্তি করে দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সমাজ সতত দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে এই মহামারীর দুষ্প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে শীঘ্রই সাধারণ জীবনধারায় ফিরে আসবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, করোনার সংকট থেকে সমাজ এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয়। এমত পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ সমাজকেই মহামারী থেকে পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও বিধিনিষেধ কঠোরতার সঙ্গেই পালন করতে হবে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমস্ত সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, মহামারীর কালখণ্ডের অভিজ্ঞতা— যেমন সুদৃঢ় পরিবার ব্যবস্থা, সুষম উপভোগ ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করে আত্মনির্ভরতা ও স্বদেশির মন্ত্রকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। ◻

আক্রমণকারীদের নাম বদল করা হোক

স্বস্তিকার ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় স্মৃতিলেখা চক্রবর্তীর 'বাংলা ভাষা, এবার ধ্রুপদী ভাষা হোক।' লেখাটা পড়ে মনের মধ্যে একটা আবেগ অনুভব করলাম। বিদেশি হানাদার বক্তিয়ার খিলজি তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা আমাদের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর চূড়ান্ত আঘাত করেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ও তার বিশাল গ্রন্থাগার যাতে প্রচুর প্রাচীন পুথিপত্র ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে। যেটা ছ'মাস ধরে জ্বলেছিল। এছাড়া বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুর, বিক্রমপুর বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে দেয়। এরূপ একজন পরধর্ম বিদ্বেষী ধ্বংসকারী বিদেশি আক্রমণকারীর নামে একটি রেলওয়ে জংশন স্টেশন আছে, যার নাম বক্তিয়ারপুর জংশন। হাওড়া, দিল্লি মেন লাইনে পড়ে। এখান থেকে একটি লাইন নালন্দার দিকে গিয়েছে। আমার একান্ত অনুরোধ ভারতীয় রেলমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, যেভাবে মোগলসরাই স্টেশন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে করা হয়েছে, গোমো স্টেশন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে করা হয়েছে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অতীশ দীপঙ্কর, আমাদের এই বাঙ্গলার সু-সন্তান তার নামে বক্তিয়ার পুর স্টেশনটা করা হোক। এটাই আমার একান্ত অনুরোধ। দয়া করে বিবেচনা করবেন।

—**লক্ষ্মণ বিষ্ণু,**
সিউড়ি, বীরভূম।

হিন্দুরা ইতিহাস ভুলে যায় খুব তাড়াতাড়ি

হিন্দুরা স্থির করেছে অতীত থেকে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনও শিক্ষা নেবে না। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবের শাসক আল হাজাজের নির্দেশে তার জামাতা মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু আক্রমণ করে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে যুদ্ধে পরাজিত করে হত্যা করেছিল। পরে শুরু করেছিল অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। ৬০০০ হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষকে হত্যা করে ৩০ হাজার হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষকে বন্দি করে আরবের দাস বাজারে পাঠিয়েছিল তাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করার জন্য। হাজার হাজার হিন্দু স্ত্রী-পুরুষকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এরপর ৪০০ থেকে ৫০০ বছর মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা আর কোনও বড়ো আক্রমণ ঘটেনি। হিন্দুরাও অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ভাঙা, অপবিত্র করা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছিল। এরপর ১০০০ খ্রিস্টাব্দে গজনির সুলতন মামুদ শয়তানের মূর্ত প্রতীক হিসেবে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল। তার সেনারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা এবং বাল্যের লীলাভূমি বৃন্দাবন তছনছ করেছিল। হিন্দুর রক্তে মথুরা বৃন্দাবনের মাটি কর্দমাক্ত হয়েছিল। হিন্দু রমণীদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিল মামুদের সেনারা। মথুরা-বৃন্দাবনের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেছিল সুলতান মামুদ। পরে হিন্দু রমণীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে গজনির দাসবাজারে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রয় করার জন্য ক্রেতাদের পছন্দের অপেক্ষায় তাদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করে প্রকাশ্য দিবালোকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। তখনও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হননি। অথচ এখনও আমরা আউড়ে চলেছি 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুর্বৃত্তাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে...' ইত্যাদি। আমরা হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করি বিপদে পড়লেও আমাদের কিছু করার নেই, স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, আমাদের কাজ শুধু ঈশ্বরের ভজনা করা। সম্ভবত ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে সেখানে আশ্রয় নেওয়া ৫০ হাজার সাধু, সন্ন্যাসী ভক্তকে হত্যা করে ধনসম্পদ লুঠ করে সোমনাথের বিগ্রহটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গজনি এবং অন্যান্য স্থানের মসজিদ এবং বিভিন্ন প্রাসাদের সোপান শ্রেণীতে প্রোথিত যাতে সেগুলি নিয়মিতভাবে মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত হতে পারে। আবার আনুমানিক ১৩৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক জগন্নাথ ধাম আক্রমণ করে সব কিছু তছনছ করে চিল্কা হ্রদের নিকটবর্তী স্থানে প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকা লক্ষাধিক হিন্দুকে হত্যা করে জগন্নাথের বিগ্রহটি উপড়িয়ে সঙ্গে করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে একটি লজ্জাজনক স্থানে সেটি ফেলে রাখে। শ্রীজগন্নাথ কীভাবে সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন সঠিক জানা নেই। বাবরের রামমন্দির ধ্বংস বা ঔরঙ্গজেবের কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার,
চন্দননগর।

দেবী কালীর পুজো ঘোর কালো অন্ধকার রাতে হয় কেন?

মহাকালীর মহাপুজো কার্তিক অমাবস্যা রাতের ঘোর কালো অন্ধকারে হয়। প্রসঙ্গত কিছু কথা জেনে নেওয়া যেতে পারে। প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে রাত্রি দেবীর কল্পনা করা হয়েছে। মনে করা হয় রাত্রিদেবী হচ্ছে আজকের দেবী কালী। বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করা যাক। রাতের অন্ধকারের রং কালো। অন্ধকারকে মানুষ ভয় করতো বা এখনো করে। মানুষ বিশ্বাস করত প্রেতাত্মাগুলি রাতে বিচরণ করে। মানুষ এসব কারণে অন্ধকার কালো রাতকে ভয় করতো। ভয়কে দূর করতে রাত বা রাত্রির কাছেই শরণাপন্ন হলো। রাত্রির রং কালো, তাই রাত্রি দেবী হলেন কালো রঙের।

ফঃ ৩

অন্ধকারই ছিল রাত্রিদেবীর প্রাথমিক রূপ। কালক্রমে 'কালো' রঙের জন্য রাত্রিদেবীর নাম হয়ে গেল কালীদেবী বা দেবী কালী। শ্মশান হচ্ছে ভূত প্রেতের স্থান। তাই প্রথমে দেবী থাকতেন মহাকাল শিবেরই শ্মশানে। ভয়ংকর দেবীকে মানুষ ভয় ও ভক্তি করত। কালক্রমে ভক্তির ফলে ভয় কমে গেল। দেবী হয়ে গেলেন দক্ষিণা বা ভদ্রকালী। শ্মশানচারী দেবী এলেন লোকালয়ে। আজ আমাদের ঘরে ঘরে আর হৃদয়ে হৃদয়ে। উল্লেখ্য, লোককথায় রচিত হয় পুরাণ। তান্ত্রিক সাধনা শুরু হয় রাতের গভীর অন্ধকারে। মহাপূজা হয় কার্তিক অমাবস্যার মধ্য রাতে ঘোর অন্ধকারে। দেবী কালী কালো অন্ধকারই পছন্দ করেন। তাই কালী পুজো রাতেই হয়। রাত্রিদেবীই হলেন মহাকালী। রাত্রির অধীশ্বরী হচ্ছেন দেবী মহাকালী।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সুন্দরবন আজ বিপন্ন

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়ছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/
খুঁজিতে যাই না আর', বলেছেন কবি। তেমনটিই বলতে চাই, নামখানার বদল আমি আজ দেখিয়াছি, তাই আমি বকখালির বদল/
খুঁজিতে যাব না আর।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এমনই এক সাধারণতন্ত্র দিবসে বকখালি গিয়েছিলাম। বকখালির তখন শৈশব। নামখানা তখন রেল মানচিত্রে স্থান পায়নি। নাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতুও ছিল না।

লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর ভ্রমণপ্রীতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভৌগোলিক ভাবে পঙ্গু এই পোড়া রাজ্যে ডেস্টিনেশন বাড়ন্ত। তাই বিয়ার কুল দিঘার পর যেমন তাজপুর, মন্দারমণি এসেছে, তেমনই নারায়ণীতলা তথা ফ্রেজারগঞ্জের পর বছর তিন হলো মৌসুনী দ্বীপের কপাল পুড়েছে। জঙ্গল নাকি বলে double footed animals come by car. বছর তিন চার ধরে মৌসুনিতে তারা আসছে by two wheelers. যাদের জীবনে বেড়ে ওঠার মধ্যে কোনো পর্যায়েই টেন্ট পিচ করার গল্প নেই সেই মাথায় ছোটো বহরে বড়ো শহরের বাঙ্গালি সন্তানেরা মৌসুনীতে টেন্টে হুইস্কি-বারবিকিউ সেবনের অভিজ্ঞতা ফেসবুকে জাহির করছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও তার মহার্ঘ সুন্দরবন আজ আক্ষরিক ভাবেই বিপন্ন। সত্তর শতাংশ প্রাণী এখানে গত একশো বছরে নাকি লুপ্ত হয়েছে। এখানকার ক্রমহ্রাসমান জলাভূমি ছোট্ট লেডিস রুমাল হয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এই fragile ecosystem-এ মৌসুনীর মতো দ্বীপে mass tourism এক আত্মঘাতী পরিকল্পনা হতে চলেছে। যেখানে ৩০ কিলোমিটার যাওয়ার এক মাত্র যান টোটো, সেখানে হাজার যুবক ও স্থানীয় মানুষজন নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছে সন্দেহ নেই। touris multiplier-এর মাধ্যমে এই পর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব মাপলে এক বিরাট অঙ্কের আয়ও পাওয়া যাবে। তবুও environment economics-এর বিচারে এখানকার carrying capacity-কে গুরুত্ব দিতেই হবে।

মাত্র ২৪ বর্গকিলোমিটারের বার্মুডা দ্বীপে ৫০ হাজার লোকের বাস। স্থানীয় প্রশাসন বছরে সাড়ে চার লক্ষ পর্যটকের সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে। গালাপাগোস থেকে ক্যারিবিয়ান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোটো দ্বীপ এবং হিল স্টেশনগুলোও আজ সচেতন। ক্রমবর্ধমান চাহিদায় লাগাম পরানো ও একই সঙ্গে সুন্দরবনকে রক্ষা করা এই দ্বিমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রাজ্যকে করতেই হবে।

—কুণাল চট্টোপাধ্যায়,
বরানগর, কলকাতা।

বাড়ির বউ কি তবে বহিরাগত?

এই যে বহিরাগত বহিরাগত বলে এত গলা ফাটাচ্ছো, একটা ব্যাপার কিন্তু আমার ভালো ঠেকছে না। তোমার ছেলে মহারাষ্ট্রে চাকরি করে আর তোমার মেয়ে তামিলনাড়ুতে চাকরি করে। ওখানকার লোকেরাও যদি তোমার ছেলে-মেয়ের গায়ে এই বহিরাগত স্ট্যাম্পটা সেঁটে দেয়, আর তারপর পদে পদে বহিরাগত বহিরাগত বলে বেইজ্জতি করা শুরু করে, মেনে নিতে পারবে তো? চাকরি ছেড়ে তো আর আসতে পারবে না। কারণ এখানে চাকরি নেই। পাড়ার মোড়ে চপের দোকান দিতে হবে। তখন কিন্তু 'আমরা আসলে ভারতীয়'—এই নীতিকথা আওড়াতে পারবে না। তাই আমি বলি কী, এইভাবে বিষাক্ত প্রাদেশিকতার বীজ বুনে নিজের পেছনে নিজেই বাঁশ দিয়ো না।

শুধু তোমার ছেলে-মেয়েরাই নয়, লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজকম্মো করে খাচ্ছে। তাদের কথাও একটু ভাবো। ওদের ভবিষ্যৎ নিয়েও এভাবে ছিনিমিনি খেলো না। কথা বলো, রাজনীতি করো তবে বেলাগাম হোয়ো না। নিজের মুখকে কন্ট্রোল করতে শেখো। তাছাড়া আরেকটা কথা বলো তো, তোমার নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি তোমার রাজ্যে বহিরাগত হয়, তবে তোমার আপন কে? পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না চীনের রাষ্ট্রপতি?

তাছাড়া সেই সেন্সে দেখলে তোমার বউও তো বহিরাগত। তোমার বাড়ির ভূমিকন্যা নয়। অন্যের বাড়ি থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যাও তো দেখি কত হিম্মত, বউকে বহিরাগত বলে এসো তো। মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে আগাপাশতলা ঝেড়ে দেবে। চিঁ চিঁ করতে করতে ফার্স্টএড লাগাতে ছুটতে হবে। যত্তসব লোভী খচ্চর! গদির লোভে, গদি হারানোর ভয়ে নিজেদের লাভের জন্য এই রাজনীতিবিদরা সবকিছু করতে পারে। সাবধান! নিজের বিবেক বুদ্ধি পার্টির কাছে না হারিয়ে সত্যকে জেনে তবেই ভোট দিন।

পার্টি নয়, ভালো প্রার্থীকে ভোট দিন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন। ভালো থাকুন। 'জয় বাংলা' নয়, ডিফেন্সের লোকের মতো 'জয় হিন্দ' বলতে শিখুন।

—নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য,
আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়।

মূল্যবোধের অভাবই সম্পর্ক-ভাঙনের কারণ

রিয়া দাস

সফল সম্পর্কের জার্নিটা কিন্তু সহজ নয়। অনেক দুর্গম পথ পেরিয়েই ভালোবাসার মুক্তি। কিন্তু ক'জনই-বা অর্জন করে প্রেমের পূর্ণতা। অধিকাংশই মাঝপথে হাতবদল করে নিজের স্বার্থে। সমগ্র বিশ্বে এমন উদাহরণ ঝুরি ঝুরি। একটি ঘটনার দিকে আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে আমাদের চারপাশেই এমন সব ঘটনা রয়েছে যা সম্পর্কের পরিণতি না পেয়ে কোনও একজনের হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছে।

১২ বছরের সম্পর্কের হঠাৎ ইতি টানল দেবাশিস। কারণটি শুনলে আঁতকে উঠবেন। সেই ছোট্টবেলা থেকে প্রেম অর্চিতার সঙ্গে। একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার স্বপ্ন দেখত প্রতিদিন। সূর্য ডোবা থেকে ওঠা পর্যন্ত রঙিন স্বপ্নের বুনটে ভেসে থাকত দু'জনেই। কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একে অপরকে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। দু'জনেই এখন পরিণত। একটু একটু করে কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে মসৃণ পথে এসেই হঠাৎ ছন্দপতন। কারণ একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট। কী ছিল সেই রিপোর্টে? থ্যালাসেমিয়ার বাহক ছিল অর্চিতা। সামান্য একটি জ্বরের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় অর্চিতাকে। এই 'জ্বর'ই যে সম্পর্কের অন্তিম রেখা টেনে দেবে, সেটা জানলে হয়তো সবকিছুই উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু মিথ্যেকে নিয়ে বাঁচতে চায়নি সে। পরম বিশ্বাসে নির্দ্বিধায় সবকিছু জানিয়েছিল দেবাশিসকে। সত্যিটা সামনে আসতেই মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি পালটে গেল। চেনা মানুষটাকে একেবারেই অচেনা মনে হলো। একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট এত বছরের সম্পর্ককে এক লহমায় শেষ করে দিল। দিন ঘুরতে না ঘুরতেই দেবাশীষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো টিঙ্কার সঙ্গে। আর অর্চিতা?

এই রকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেও ঘটে চলেছে। সারা বিশ্বে ব্রেক আপ এবং ডিভোর্সের সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো প্রতারণা। একজন অন্ধের মতো বিশ্বাস করছে আর অপরজন সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অন্য নেশায় মেতে রয়েছে। এটাই হলো ডিজিটাল যুগ। যেখানে কেউ না কেউ প্রতিনিয়ত ঠকে যাচ্ছে। প্রতারণা হলো এমন একটা শব্দ, যেটা একের পর এক সম্পর্ককে কলুষিত করে। স্বার্থপর মানুষের আসলে সেই বিবেকবোধ থাকে না। কারণ তাদের কাছে অন্যের কষ্টটা কষ্টই নয় বরং অন্যের কষ্টের থেকেও তারা নিজের সুখকে বেশি প্রধান্য দেয়।

কী দোষ ছিল অর্চিতার? সম্পর্কটা কি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত না? মেডিক্যাল রিপোর্টে অর্চিতা মারা যাবে এমন কথা তো লেখা ছিল না। না হয় নিঃসন্তানই থাকত। কী ক্ষতি হতো তাতে? দত্তকের পথও খোলা ছিল। বিকল্প কোনও কিছুরই খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল না দেবাশিস। অবশেষে 'প্রেমের মৃত্যু'। আজ অর্চিতার কী হলো তার খবর কি কেউ রেখেছে?

সম্পর্কের শুরুটা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় হলেও শেষটা হয় খুব তাড়াতাড়ি। সেটা যে শুধু ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয় তা নয়। এর জন্য সবথেকে বেশি দায়ী থাকে একপক্ষের সুবিধাবাদী নীতি বা তাদের নিম্নরুচির মানসিকতা। তাদের কাছে 'সম্পর্কের টানাপোড়েন'-এর অনুভূতিটাই থাকে না। নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন থাকে তারা। বিচ্ছেদ, ঠকানো এইগুলির মর্মার্থ তাদের কছে অর্থহীন। নিজেদের সুবিধার্থে তারা অন্যের মন নিয়ে খেলতে মশগুল থাকে। কেউ না কেউ সেই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়তই।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তুলনামূলক সচ্ছল দম্পত্তির দুজন মাংস-ভাত খাবে, কেউ হয়তো মাছ-ভাত খাবে, আমি আর তুমি না হয় দুটো রুটি ভাগ করেই খাব। নিজের মনের মানুষের সঙ্গে হাজার দুঃখ-কষ্টেও আনন্দে বেঁচে থাকব একে অপরজনকে আঁকড়ে— এই মূল্যবোধটাই হারিয়ে যাচ্ছে আজকাল। ঘোর কলিযুগে নিঃস্বার্থ প্রেমের তুল্যমূল্য বিচারে 'ভালোবাসা'র চেয়েই এগিয়ে 'মোহ এবং অর্থ'ই। ▫

শিশুর হামাগুড়ি থেকে দৌড়াদৌড়ি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

নিজে নিজে প্রথম পাশ ফেরা, উপুড় হওয়া, ঘাড় শক্ত হতেই বসতে শেখা কিংবা হামাগুড়ি থেকে টলমল হাঁটা তারপর কচি পায়ে দৌড়াদৌড়ি। সদ্যোজাত থেকে দস্যি হয়ে ওঠার পর্বটা ভীষণ আনন্দের, তবে শিশুর স্বাস্থ্য মজবুত করার সঠিক অধ্যায় এই সময়টাই। তাই জন্মের পর ছ'মাস বয়স থেকে একবছর বাচ্চার সঠিক পুষ্টি জরুরি, আর এই পর্বেই মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে দুনিয়ার অজস্র বিভিন্ন স্বাদের খাবার প্রথম চেখে দেখে শিশু। চিনতে শেখে খিচুরি, আনাজ সিদ্ধ, স্যুপ, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। সাধারণত এক বছরের পর থেকে শিশুকে সাধারণ খাবারে পুরোপুরি ভাবে অভ্যস্ত করে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর ছ'মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে শিশুর পুষ্টির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সময়-কে 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' বলা হয়। এই সময় শুধু সঠিক খাবার খাওয়ালেই হয় না, পাশাপাশি শিশুকে ধীরে ধীরে সব ধরনের খাবার খাওয়ানোর পদ্ধতিও শেখাতে হয়। কিন্তু প্রথমবার টক-ঝাল-মিষ্টির মিশেলে তৈরি বিভিন্ন খাবারের অভিজ্ঞতা নেওয়া কোনও শিশুর কাছেই সহজ হয় না। বেশিরভাগ অভিভবকই তাঁর শিশুকে যথাযথ খাবার দিতে নাজেহাল হয়ে পড়েন। তবে অযথা দুশ্চিন্তা করে শিশু যে খাবার যতটা খেতে চাইছে তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিন। তাড়াহুড়ো নয়, ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে আপনার সন্তানের স্বাভাবিক খাবারের অভ্যাস তৈরি করুন।

ছ'মাস থেকে সব ধরনের খাবার : শিশুর ৫ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত সময়ের খাদ্যাভ্যাসকে 'কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং' বলা হয়। অর্থাৎ শিশুকে মাতৃদুগ্ধের অভ্যাস থেকে মুক্ত করা। ছ'মাস বয়সের পর থেকে শিশুর মায়ের অর্ধেক ডায়েট নেওয়া উচিত। যেহেতু সাধারণ ছ'মাসের পর মায়ের মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ বাড়ে না, ফলে এই সময় থেকে যদি অন্য খাবার না দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চার শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়। এমনকী যদি চার মাসের পর ব্রেস্ট ফিডিং কম হয় তাহলে তখন থেকেই ধীরে ধীরে তরল বা আধা কঠিন খাবার দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া এই সময় থেকে শিশুর শরীরে হজমের উৎসেচক তৈরি হয়। মাড়ি শক্ত হতে শুরু করে। সাধারণত শিশু ছয় মাস থেকে বায়োলজিক্যালি অন্য খাবার খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়।

কোন খাবার শিশুকে খেতে দেবেন : সাধারণত কম প্লিমেন্টারি ফিডিং দু'রকমের হয়। (১) বাড়িতে তৈরি খাবার। (২) বাজার চলতি প্রক্রিয়াজাত খাবার। বাড়ির খাবারের ভ্যারাইটি বেশি এবং ফ্রেস রান্না করা খাবার বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। অন্যদিকে বাজারে বিক্রিত টিনফুড তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। শিশুকে অনেকক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকতে হলে এই ধরনের খাবারই খিদের চাহিদা অনেকটা মেটায়।

৭-৯ মাসের শিশুকে বাড়ির খাবার খাওয়ান : এই সময় শিশুকে চাল ও ডালের পাতলা খিচুড়ি দেওয়া যায়। ডালিয়ার খিচুড়ি দেওয়া যাবে। খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, গাজর পুরোপুরি চটকে দিতে পারেন কিংবা এইসব সবজি সিদ্ধ করে চটকে খাওয়ানো যায়। ডিমের কুসুম খাওয়ানো যাবে। যদি আপেল সহ্য করতে পারে তাহলে আপেল সিদ্ধ করে দিতে হবে। রুটির মোটা অংশ ছিঁড়ে গরম সবজির স্যুপে অথবা ডালে ডুবিয়ে নরম করে দিন। এক বছরের আগে বাজার চলতি দুধ না দেওয়াই ভালো। ৯ মাস থেকে দই ছানা দেওয়া যায়।

৯-১২ মাসের মেনু লিস্ট করে নিন।

- এই সময় থেকে শিশুকে খাবার পছন্দ করার সুযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ স্বাদ রুচিবোধ ৯ মাস থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়। এই সময় চাল-ডালের অথবা ডালিয়ার খিচুড়ি দিতে পারে।
- রুটির মোটা অংশের সঙ্গে পাউরুটি হালকা করে সেঁকে সবজির স্যুপে কিংবা ডালে ভিজিয়ে খাওয়ানো যায়। সবজি সিদ্ধ করে চটকে অথবা তার নির্যাসের স্যুপও দিতে পারেন।
- টক জাতীয় ফল বাদে যে কোনো সহজপাচ্য ফল চটকে খাওয়ানো যায়।
- ৯-মাস থেকে ১২ মাসের খাদ্যাভ্যাসকে 'ফ্যামিলি পট ফিডিং' বলা হয় অর্থাৎ এই সময় পরিবারের সকলের থেকে শিশুকে কম তেল ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। প্রাণীজ প্রোটিনও এই সময় থেকে খাওয়ানো শুরু করতে হবে। নরম মাছ মাংস সিদ্ধ, চিকেন স্টু দিতে পারেন। মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফ্যান ভাত, দুধ ও চাল দিয়ে পায়েস খাওয়ান।
- মসুর ডাল সিদ্ধ, আলু, গাজর, পেঁপে সিদ্ধ চটকে হজম করার মতো করে খাওয়াতে পারেন। পাতলা করে সুজি খাওয়ান। নরম বিস্কুট জলে ভিজিয়েও খাওয়াতে পারেন।

একঘেয়ে খাবার শিশুকে দেবেন না : শিশু একঘেয়ে খাবার পছন্দ করে না। বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়ানো উচিত। যে কোনও খাবার সুস্বাদু করতে স্বাদ অনুযায়ী তাতে নুন, চিনি কিংবা গুড় দিতে পারেন। স্বাদ বদলে মাঝে মাঝে ঘি মাখনও ব্যবহার করা যাবে। একই সঙ্গে কোন পাত্রে খাবার দেওয়া হচ্ছে, খাবারের স্বাদ কোন পরিবেশে খাবার দেওয়া হচ্ছে এই সব কিছু শিশুর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। ▮

আমাদের চিন্তা, ভরসা আপনারা

গতানুগতিক প্রতিশ্রুতি নয়,
আপনারা দায়িত্ব দিলে আরামবাগের জন্য যা করে দেখাতে চাই।

- আরামবাগ বিধানসভায় বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এতদিন সেভাবে কিছুই ভাবাই হয়নি। এলাকা ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প এবং অন্তত আরামবাগ বিধানসভায় কয়েক একর জায়গায় দুটি হাউসিং তৈরি করে কয়েকশো বেকার ছেলেদের ছোট কারখানার জন্য ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করব। যেখানে বেকার ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট কারখানা তৈরি করতে পারবে।
- সাধারণ মানুষকে লোন পেতে, জমির কাগজ তৈরি করতে, আধারকার্ড, ভোটারকার্ড প্রভৃতি কার্ড সংশোধান করতে বা তৈরি করতে দিনের পর দিন সরকারি অফিসে ধরণা দিতে হয়। বিধায়কের দায়িত্বে একটি নির্দিষ্ট অফিস তৈরি হবে। যেখানে ১৬ ঘণ্টা মানুষের এই ধরণের সমস্যা সমাধানে কাজ করা হবে।
- সাধরণ মানুষকে বিধায়ক অফিসে আসতে হবে না। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় সপ্তাহে একদিন করে বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন। সেখানে জনতার দরবারের মাধ্যমে প্রয়োজনের সমাধান করা হবে।
- ক্লাবের খেলাধুলা সহ প্রকৃত মানোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে।
- আরামবাগ মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যবহার্য জিনিস ও বইপত্র নিয়ে মিউজিয়াম গড়ে তোলা হবে।
- গরীব মানুষদের স্বনির্ভর গড়ে তুলতে যাতে সঠিকভাবে কাটমানি ছাড়া লোন পায় তা গুরত্ব দিয়ে দেখা হবে।
- মহকুমার বীর শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে আরামবাগ ঢোকার মুখে আরামবাগ গেট তৈরি হবে। যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।
- আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়কে ত্রিভাষা (বাংলা-ইংরাজি-হিন্দি) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি আরামবাগে অন্তত একটি পিপিপি মডেলে ত্রিভাষা স্কুল স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- প্রতি ৫ কিমি অন্তর পুরুষ ও মহিলা শৌচাগার নির্মাণ করা হবে।
- আরামবাগে একাধিক রাইসমিল আছে, তাদের মিল থেকে নির্গত বর্জ্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করা হবে।
- আরামবাগে ষাটোর্ধ্ব মানুষের জন্য একটি মনোজ্ঞ ওল্ডেজ পার্ক তৈরি করা হবে।
- আরামবাগ বিধানসভায় ড্রেনেজ সিস্টেম কিছুই প্রায় নেই বললেই চলে। বিধানসভাজুড়ে আধুনিক ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তোলা হবে।
- সবজি সংগ্রহের জন্য একটি কোল্ডস্টোরেজ তৈরি করা হবে।
- ধান উৎপাদনের পর কৃষিজমিজুড়ে নারা পোড়ানো পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। একেবারেই বৈজ্ঞানীক উপায়ে রাসায়নিক ব্যবহার করে সেগুলিতে সারে পরিণত করে কৃষি জমিতেই ব্যবহার করার পদ্ধতির প্রচলন করা হবে।
- এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য সারা বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় ফ্রি কোচিং ক্লাস চালু করা হবে।
- আরামবাগ একসময় নাটকের পীঠস্থান ছিল। এখানে রবীন্দ্রভবনের এতটাই দুরাবস্থা যে সেখানে নাটক মঞ্চস্থ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। একটি নাট্যশালা ও রবীন্দ্রভবনকে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হবে।

আরামবাগের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে আমরা দায়বদ্ধ।

আরামবাগের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে
২০০ (তপঃ) আরামবাগ বিধানসভায়, বিজেপি প্রার্থী

বিশিষ্ট শিক্ষক,
আরামবাগের ভূমিপুত্র

মধুসূদন বাগ কে

পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

আরামবাগ বিধানসভা বিজেপি কর্তৃক প্রচারিত ও আরামবাগ এই সময় পরিবার কর্তৃক মুদ্রিত

বিজেপির সংকল্পপত্রে রয়েছে অর্থনীতির হাল ফেরানোর দিশা

ভারতীয় জনতা পার্টি জোর দিয়েছে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের ওপর। যার সম্ভাবনাও প্রচুর। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষেত্রে একটা আর্থিক জোয়ার আনতে চেয়েছে তারা।

বিশ্বপ্রিয় দাস

একটি রাজ্যের নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে ঠিক হয়ে যায় যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে রাজ্য বা দেশকে সাজাতে চাইছে। তাঁরা রাজ্যের ভোটার তথা জনগণের কাছে নিজেদের পরিকল্পনাকে নিয়ে আসে। তাঁরা বলেন, জনগণের হিতেই এই পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার অংশ হয়ে ওঠে সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে মানুষকে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা দান, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামোগত ও সামগ্রিক উন্নয়ন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক চিন্তাধারার প্রয়োগ প্রভৃতি। যদিও মূল বিষয়ের মধ্যে থাকে জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের নিরাপত্তা প্রদান। এবারের নির্বাচন গত নির্বাচনগুলির থেকে অনেকাংশেই আলাদা। তাঁর কারণ আর কিছুই নয়, একটি অতিমারীকে সামান্য হলেও কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি আমরা। এই অতিমারীতে রাজ্যে কর্মহীনের সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নেমে এসেছে চরমতম আঘাত। সঞ্চয় ভাঙাতে হয়েছে জীবন রক্ষার তাগিদে, কাজ হারিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। কেননা মানুষের হাতে অর্থের জোগান গেছে কমে। অন্যদিকে করোনা নিয়ে মানুষের

আতঙ্ক এখনো দূর হয়নি, বরং তাঁর দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে আরও আতঙ্কিত সবাই। সে কারণেই চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর বেশি করে নিরাপত্তা চাইছে সবাই। বিশেষ করে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায়। ফলে কোন দল, ২০২১-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে কী উন্নয়ন পরিকল্পনা করল, সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দিকে তাকিয়ে ছিল সবাই।

এবার সেই নির্বাচনী ইস্তাহার বা সংকল্প পত্রের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়া যাক।

রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে রাজ্যের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর। তারা রাজ্যের এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে এক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে, বেকারত্বের হার কমিয়ে টেনে তুলবে ওপরে। এই বিষয়ে ভোটাররা প্রশ্ন তুলতেই পারেন, গত দশ বছরের শাসনকালে তারা এই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল কতটা? বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় শিল্পায়নের হাত ধরে। সেই শিল্পায়নের ধারা গত দশ বছরে কোথায়? এই বিষয়ে

সোনার বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখানো রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের ডাক দেওয়া বিজেপি কিন্তু কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছে, তাঁরা প্রতিটি পরিবারের হাতে অর্থের জোগান দিতে পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির সুযোগ দেবে। তাঁদের আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্য সহজ শর্তে বেকারদের ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর যেমন করে তুলবে, তেমনি উল্টোদিকে বাড়াবে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এছাড়াও বৃত্তিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও বৃদ্ধির কথার পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও কর্মমুখী সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যের নতুন প্রজন্মকে পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে আরও উন্নত করে তুলে, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলার কথা। এক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে রয়েছে, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের সরকারি ভাবে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে সাহায্যের কথা। এদিকে ৩৪ বছর শাসন করা বিপুল বেকার সৃষ্টি করা বামেদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি। বর্তমান সরকারের নানা সরকারি পরীক্ষায় দুর্নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে তারা যোগ করেছেন স্বচ্ছতার বিষয়টি। তারা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরির ওপর। শিক্ষার বিষয়েও একগুচ্ছ কথা তারা বলেছে, তারা শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচক হিসেবে ধরে এগোতে চাইছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, তাঁদের সময়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা কেন তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে? প্রাথমিকস্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়ায়, রাজ্যের একটি প্রজন্ম কতটা পিছিয়ে পড়েছে?

এবার আসা যাক রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের হিতে বর্তমান শাসক দল কী ভাবছে? তারা কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা একর পিছু সাহায্য করে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে চাইছে। এর ফলে কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা দেওয়াটাও একটা পরোক্ষ লক্ষ্য। অন্যদিকে তার বলেছে, রাজ্যের বহু জমির চরিত্রকে পালটে দিয়ে নতুন উন্নত কৃষিক্ষেত্র তৈরি করার বিষয়টি। সঙ্গে অবশ্য বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক ফসল চাষে উৎসাহের বিষয়টিও রয়েছে তাদের ইস্তাহারে। অন্যদিকে বিজেপির সংকল্পপত্রে প্রথমেই রয়েছে, কৃষকদের হাতে অর্থের জোগান বাড়িয়ে তাদের মনোবল বৃদ্ধি করার কথা। তারা ৭৫ লক্ষ কৃষকদেরও মৎস্যজীবীদের বার্ষিক ভাতা দেবার বিষয়টি এনেছে। লক্ষ্য সেই আর্থিক ভাবে কিছুটা হলেও সাহায্য করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার করতে রাজ্যের কৃষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বিজেপির সংকল্পপত্রে। তারা ছোটো বড়ো ফুড পার্কের পাশাপাশি ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের কথাও বলেছে। ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের নষ্ট হবার পথ থেকে অনেকটাই বাঁচানো যাবে।

এদিকে বিজেপি একটি মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছে তাদের সংকল্প পত্রে। তারা প্রথম থেকেই রাজ্যে শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ টানার ব্যাপারে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারা ইনভেস্ট বাঙ্গলা স্থাপন করছে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করতে ;আগামী দিনে দেশে শীর্ষ স্থানের লক্ষ্যে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাবে, তেমনি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎসাহে ১০০ শতাংশের ক্রেডিট গ্যারান্টি ও ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত মুক্ত ঋণ দেবার কথাও

রাজ্যের কৃষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বিজেপির সংকল্পপত্রে। তারা ছোটো বড়ো ফুড পার্কের পাশাপাশি ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনের কথাও বলেছে। ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের নষ্ট হবার পথ থেকে অনেকটাই বাঁচানো যাবে।

২০১৯ লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে যেসব বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে

বিধানসভা	বিজেপি	তৃণমূল
কোচবিহার		
মাথাভাঙা	১০৭০৬৩	৮৬১৮৮
কোচবিহার উ:	১১৮৬০৬	৯১৩৮০
কোচবিহার দ:	৮৬৪৩১	৮০৪১০
দিনহাটা	১১৪৯৮১	৯৯৪৪২
নাটাবাড়ি	১০৪৫৪৩	৮৬০১৮
আলিপুরদুয়ার		
তুফানগঞ্জ	৯৮৭৭৬	৯১২৯০
কুমারগ্রাম	১১৬২৩	৮৭২১০
কালচিনি	১১১৪৭৭	৬৪০৪৫
আলিপুরদুয়ার	১১৪৮৭৯	৭৭৮৫৯
ফালাকাটা	১০৯২৮০	৮২২১০
নাগরাকাটা	১০৩৮৬৫	৫৩৬২১
মালদহ দক্ষিণ		
মানিকচক	৮১৮০৯	৫১৯২০
ইংলিশবাজার	১৩২৮৬০	৩৮৪৭৮
বৈষ্ণবনগর	৮১৪৭৫	৫৫১৪৬
ব্যারাকপুর		
বীজপুর	৫৮৯১২	৫১০১৬
নৈহাটি	৬৫৬০১	৬৪৩৭৫
ভাটপাড়া	৬৪৬৮০	৩৪৯৭৩
জগদ্দল	৭৭৭৩৩	৬৯৩৬৯
ব্যারাকপুর	৬৪০৪৬	৬০৫২৭
দমদম		
রাজারহাট-গোপালপুর	৭০৮২৮	৭০০৮৫
জলপাইগুড়ি		
মেখলিগঞ্জ	৮৭১৪০	৮২৪৩৫
ধুপগুড়ি	১০৫৭২৯	৮৭৯৬৩
ময়নাগুড়ি	১১০৮১৯	৯৬০৭২
জলপাইগুড়ি	১১২১৪৭	৭২৯৬২
ডাবগ্রাম-		
ফুলবাড়ি	১৫০৫৬৬	৬৪৪৪৯
মাল	১০০৯৯৮	৭৬৯৩৯
দার্জিলিং		
কালিম্পং	৯৬৮৭৭	৩৪৩৮২
দার্জিলিং	১১৯৪২৮	৩৩৬০৪
কার্শিয়াং	১২২৩৯৩	৩৪৭৯৬
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি	১৪৪১৭৫	৪৫,২৭৭
শিলিগুড়ি	১০৫১৪৮	৩৯৬৬২
ফাঁসিদেওয়া	১০৭১১৫	৫৩৮৫৪
মুর্শিদাবাদ		
মুর্শিদাবাদ	৮০৯৬৬	৭৭৫৬৭
বারাসত		
হাবড়া	৯৭৩১০	৭৭৮৫৮
বিধাননগর	৭৭৮৭২	৫৮৯৫৬
রায়গঞ্জ		
করণদিঘি	৮২০০৯	৬৬০৪৫
হেমতাবাদ	৮৫২১০	৭৮৮২৮
কালিয়াগঞ্জ	১১৮০৯৫	৬২১৩৩
রায়গঞ্জ	৮৩৯৪৪	৪১৭৪২
বালুরঘাট		
বালুরঘাট	৮০৬৭৪	৪১৯৮১
তপন	৮৯৭৩৭	৬৬৪৮৩
গঙ্গারামপুর	৯২১৩৮	৭০০৫৩
কৃষ্ণনগর		
তেহট্ট	৮৯৪৩০	৮৭৩৬৯
কৃষ্ণনগর উ:	১১৫৩৭৫	৬২৩২৪
কৃষ্ণনগর দ:	৮২৭৮১	৭৬০৫৭
রাণাঘাট		
শান্তিপুর	১১২৫৯৯	৭৭৫৮৭
রানাঘাট উ:প:	১১৯০০০	৭৪৫৬৮
কৃষ্ণগঞ্জ	১২১২৩৬	৮৩৭২৯
রানাঘাট উ:পূ:	১১৬৮৩৭	৭৩৬১১
রানাঘাট দ:	১২৪৬০৭	৭৯৬৭৬
চাকদহ	১০১১৩১	৭১১৪৪
মালদহ উত্তর		
হবিবপুর	১০৭৬৩০	৫৩৭৮৪
গাজোল	১০৮৩৫১	৬৭১৮০
মালদহ	১০৪৮২৫	৫০৪৯০
বনগাঁ		
কল্যাণী	৯৩২৯২	৮৬২৩৬
হরিণঘাটা	৯৪৩৬৬	৮৪৮৯৯
বাগদা	১০৯৭৪০	৮৫২৮৩
বনগাঁ উত্তর	১০৪৫৫৮	৭৬৬২৮
গাইঘাটা	১০৯৯২২	৭৩৯৭৪
কলকাতা দ:		
রাসবিহারী	৫৭৯৭৬	৫২৫৫৫
আরামবাগ		
পুরশুড়া	১০৭৭৫৯	৮১৯১৭
গোঘাট	৯৫২৮৪	৮৭২১৭
বাঁকুড়া		
রঘুনাথপুর	১০৯৮৩২	৬৭১৯৯
শালতোড়া	৮৯০৭৩	৭৪০১৭
ছাতনা	৯৫৬৬১	৬৪৪৭৯
রানিবাঁধ	৯৩৯৫৬	৭৮১৪২
রাজপুর	৮৩৭৭৪	৮০৪২৩
তালডাংরা	৮৭৮৬২	৭০৫৫৮
বাঁকুড়া	১১২০৮০	৬৫৩০৪
বিষ্ণুপুর		
বড়জোড়া	৯১৭৩৬	৮০১১৬
ওন্দা	১০৬৭৮৮	৮০৪১৫
বিষ্ণুপুর	৮৯৮০৬	৬৬৯৮৮
কোতুলপুর	৯৭৯০৭	৮৮৮০৮
ইন্দাস	৯৮১৮৮	৮৪৫৯১
সোনামুখী	৯৮৯৮৩	৭৫১৪৮

কলকাতা উ:		
জোড়াসাঁকো	৯১১৪৭	৪৭২৬৫
শ্যামপুকুর	৪৮৯০৫	৪৬৭৩৫
হাওড়া		
হাওড়া উত্তর	৬৭০১৭	৬৪০৫৬
ঘাটাল		
পাঁশকুড়া পশ্চিম	৯৭৫২৮	৯৪৬৮৩
ডেবরা	৮৪৬১৮	৮০৫৯৯
বর্ধমান পূর্ব		
কাটোয়া	৮৯১৭৫	৮৭৩১৬
বর্ধমান-দুর্গাপুর		
গলসি	৯৩১৭৭	৮৩৫৫৬
দুর্গাপুর পূর্ব	৯০৪৫৫	৬৩৮৬৪
দুর্গাপুর পশ্চিম	১০৯১৫৩	৫৯৬৪২
শ্রীরামপুর		
শ্রীরামপুর	৭৫৩২৬	৭২৮২৩
ঝাড়গ্রাম		
নয়াগ্রাম	৮৪৩১৬	৮০৯৭৮
ঝাড়গ্রাম	৮৩৫৪০	৮২০৪৫
গোপীবল্লভপুর	৮৮৬৭২	৮১৮৩৬
গড়বেতা	৯১৩২৮	৮৪৫১৭
বান্দোয়ান	৯৮০৩৯	৯৫০৬৯
মেদিনীপুর		
এগরা	১০৯৫০৯	১০০৮১৬
দাঁতন	৯২৪১৩	৮৫৭২৮
কেশিয়াড়ি	১০০০৩২	৮৯১৫৮
খড়্গপুর সদর	৯৩৪২৫	৪৮২৯৩
নারায়ণগড়	৯৭৩২৪	৮৮৫৭৪
মেদিনীপুর	১১০৩৭২	৯৩৭৩১
আসানসোল		
পাণ্ডবেশ্বর	৭০২৯৬	৬৪২৭৫
রানিগঞ্জ	৯২৮৮২	৬১১৭২
জামুরিয়া	৭৬০৫১	৫৭৯৯৯
আসানসোল দ:	১১১০২১	৫৭২০১
আসানসোল উ:	৯৮০২০	৭৭৭০৬
কুলটি	১০৫১৭৬	৫৫৮২৫
বারাবনি	৭৯২৮১	৬১৪০৬
বোলপুর		
ময়ূরেশ্বর	৮৭২৬০	৮৫৫০১
হুগলী		
সিঙ্গুর	৯৩১৭৭	৮২৭৪৮
চুঁচুড়া	১১৬৬০৩	৯৫৫৮৭
বলাগড়	১১০১৭৫	৭৬১২১
পাণ্ডুয়া	৮৯৮৮৩	৮৯১৮১
সপ্তগ্রাম	৯৪৩৯২	৭২৮০৭
পুরুলিয়া		
বলরামপুর	১০০৪১৯	৬৪৯৫০
বাঘমুণ্ডি	১০০৩১২	৪৭৬০৪
জয়পুর	৮৮০৮৭	৫৬৩৪৩
পুরুলিয়া	১০২৭৪৯	৬৬২৫২
কাশীপুর	৯১০৭৯	৭৪৯২৫
পাড়া	১০০০৫৬	৫৮৮১৪
বীরভূম		
দুবরাজপুর	৯৫৪৬৬	৮০৯৫৪
সিউড়ি	১০০২২৮	৯১০৯৭
সাঁইথিয়া	৯৭,০১০	৯৬৭৯৫
রামপুরহাট	৯৮১৭৪	৮৫০৪৯

বলেছে। মূলত আর্থিক সংস্কার তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। রাজ্যের ৩৪ বছর শাসন করা বামদলগুলির ইস্তাহারে সেইদিশা না থাকলেও আছে কৃষি সংস্কার ও উন্নতির জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব। তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করার মতো সেচের এলাকাকে বাড়ানোর বিষয়টি। সঙ্গে কৃষি সমবায় ক্ষেত্রগুলিকে পুনরুজ্জীবন দেওয়ার বিষয়টি।

অন্যদিকে বিজেপির সংকল্প পত্রে মহিলাদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সেই অর্থে বাম ও তৃণমূলের ইস্তাহারে সেরকম ভাবে উপেক্ষিতই রয়ে গেছে বিষয়টি। পানীয় জলের বিষয়টি সবাই গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকায়।

স্বাস্থ্যের বিষয়টিও সবার ইস্তাহারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তবে বিজেপির সংকল্পপত্র সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। ১০ হাজার কোটির স্বাস্থ্য তহবিল গঠনের কথা তারা বলেছে, রাজ্যের হাসপাতালের সংখ্যা ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার কথা বলেছে, আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে প্রতি পরিবারের জন্য সারা ভারতের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গে, জঙ্গলমহলে ও সুন্দরবনে তিনটি নতুন এইমস-এর কথাও তারা বলেছে। ফলে একমাত্র সদর্থক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা দেবার বিষয়টিও তাদের সংকল্পপত্রে স্থান পেয়েছে।

বিজেপি জোর দিয়েছে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের ওপর। যার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে একটা আর্থিক জোয়ার আনতে চেয়েছে তারা।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

ফ ঃ ৪

২০১৯ লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে যেসব বিধানসভায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে

বিধানসভা	বিজেপি	জয়ী প্রার্থী
কোচবিহার		
শীতলকুচি	১০৮৫৪১	১০৯৭৭১
সিতাই	৮৮৪৬৯	১২৩১৩০
মালদহ দক্ষিণ		
মোথাবাড়ি	৪৩০৫৪	৬১৩৯৩
ফরাক্কা	৪৬৮৮৬	৭৬১০৭
জঙ্গিপুর		
সুতি	৫০৯৫৭	৯৪৯১১
জঙ্গিপুর	৬৬১৯৩	৭৯৫২৭
সাগরদিঘি	৪১৯৬৭	৭৫৩৭৪
নবগ্রাম	৫১৭৫৭	৭৬৫৭৪
খড়গ্রাম	৪৮৩৭৪	৭৭৮৪৮
দমদম		
খড়দহ	৭২৪৯৯	৭৩৭৬৭
দমদম উত্তর	৭৮৩৬৪	৮৩৯৯৫
পানিহাটি	৬৪০৭১	৭৩৮০২
কামারহাটি	৪৫৬৩১	৬৩৩৫৬
বরানগর	৫৫৪৮১	৭০১৭৬
দমদম	৭১৪২৪	৭৬৫২৬
জলপাইগুড়ি		
রাজগঞ্জ	৯০৪০৭	৯৪৭২৭
দার্জিলিং		
চোপড়া	৪৯৫২১	৯৪২৯৮
মুর্শিদাবাদ		
করিমপুর	৭৩১৭৩	৮৭৫১৩
বারাসত		
অশোকনগর	৭৯৪১৮	৯২৭৪৯
রাজারহাট-নিউটাউন	৭৯৭০০	১০৩৩৪৩
মধ্যমগ্রাম	৭২৩৭৯	১০৬৮১৫
বারাসত	৮৯৪৩৩	৯৩০২৩
দেগঙ্গা	৪০৮০৯	১১৪৭২৫
বসিরহাট		
বাদুড়িয়া	৫৬৩১০	৯৬২১৬
হাড়োয়া	৩৬৯৯৫	১৩৪৫৪৩
মিনাখাঁ	৫১৮৬৭	১১৮৪৩৩
সন্দেশখালি	৭৬৬৮৮	১০৩৬০০
বসিরহাট দক্ষিণ	৯০৫০৬	১০৫৪০৬
বসিরহাট উত্তর	৪৪৯৮০	১২৭৭৩৬
হিঙ্গলগঞ্জ	৭৩৭৫৯	৯৫৯৮৬
রায়গঞ্জ		
চাকুলিয়া	৫১৩০৪	৫৯১২৯
গোয়ালপোখর	৩১২৯০	৭৯৩২৮
ইসলামপুর	৫৬৫৩১	৬০৭৯৬
বালুরঘাট		
ইটাহার	৫৯৭২৯	৮৭৫০৬
কুশমণ্ডী	৭৬৮৬৪	৭৭০১৯
কুমারগঞ্জ	৬২৭৫৯	৮১৫১৮
কৃষ্ণনগর		
পলাশিপাড়া	৫৯১৩৫	৯৫১৯৫
কালীগঞ্জ	৬২৬১১	৯৯৮৩৯
নাকাশিপাড়া	৮২৮১৩	৮৭৮৯৩
চাপড়া	৫৫৬০৩	১০৪৯৭৫
রানাঘাট		
নবদ্বীপ	৮৪৩৫৭	৮৮৪১২
জয়নগর		
গোসাবা	৭২২৩৬	১০১৫২২
বাসন্তী	৫৬৯২৭	১১৩৩৮৪
কুলতলি	৭৮৬৯৫	৮৭১০৬
জয়নগর	৭৩০৯৫	৮৯৬৭২
ক্যানিং পশ্চিম	৭৭০৫৬	১০২৪০২
ক্যানিং পূর্ব	২৩৭২৪	১৬৬৮৯৭
মগরাহাট পূর্ব	৬২৩০৭	৯৯৯৫১
মথুরাপুর		
পাথরপ্রতিমা	৭৭২৮১	১১৩০৬০
কাকদ্বীপ	৮০৭৪৭	১০৬২৩০
সাগর	৮৭০৫৮	১১৯০৭০
কুলপি	৬৪৮২৪	৯০৫১২
রায়দিঘি	৯১৩৪২	১০৪২৬১
মন্দিরবাজার	৭২৫৯৫	৯৩৮১৯
মগরাহাট পশ্চিম	৪৮৪২০	৯৯৫১১
বনগাঁ		
স্বরূপনগর	৬৮২০৩	৯২১৭৪
ডায়মন্ডহারবার		
ডায়মন্ডহারবার	৭৩৬৭৩	১০৯১৩৪
ফলতা	৭০৯১২	১১৪৬৮৯
সাতগাছিয়া	৮৬৭৬১	১১১৫৪০
বিষ্ণুপুর	৭৩৫২৯	১১৭৬১৭
মহেশতলা	৬৯২৫২	৯৮০৯২
বজবজ	৬৩১১৮	১১৯৬৭৫
মেটিয়াবুরুজ	৩২৮০২	১১৯৯৭৮
যাদপুর		
বারুইপুর পূর্ব	৭২২১৪	৯৯৭১৯
বারুইপুর পশ্চিম	৫৯২২৭	৯৫৩৫৯
সোনারপুর দ:	৭৩৮০০	৮৮৩৫৪
সোনারপুর উত্তর	৬৭৭৯৬	১০০১৬৭
কলকাতা দক্ষিণ		
ভবানীপুর	৫৭৯৬৯	৬১১৩৭
কলকাতা বন্দর	৪৫৮৬৩	৮২১০২
বেহালা পূর্ব	৭৩৪৮৩	৮৯৩৪১
বেহালা পশ্চিম	৭৫০৫১	৯১২১৬
বালিগঞ্জ	৪২৮৫০	৯৭৩০২
কসবা	৬৩৮৯৪	৯৮৫৩৫
আরামবাগ		
হরিপাল	৮৫৭৩১	৯৫২৯৫
তারকেশ্বর	৮৩৭৫৩	৮৮০৯৬

আরামবাগ	৮৯৮৭৬	৯৩৮৮৩
খানাকুল	৮২১৮৩	৯৬৪০৫
চন্দ্রকোনা	১০৩১৬৯	১০৬৮০০

তমলুক

তমলুক	৮৭১৩২	৯৩৬৮০
পাঁশকুড়া পূর্ব	৭২০৫৭	৭৯৪৩৭
ময়না	৮৮৪৯৭	১০০৮৮০
নন্দকুমার	৮২১১৬	৯৭৪৭৪
মহিষাদল	৭৯২৯৯	৯৬২১৫
হলদিয়া	৬১৪৭৫	১২৫২৬৯
নন্দীগ্রাম	৬২২৬৮	১৩০৬৫৯

বিষ্ণুপুর

খণ্ডঘোষ	৭১৫০০	১০২৪৯৪

কলকাতা উত্তর

চৌরঙ্গি	৩৮৮৮৫	৬৫৪৪৫
এন্টালি	৪৮৩৯১	৮৯৭১১
বেলেঘাটা	৪৬৬৮১	৯৭৫৮৩
মানিকতলা	৬০২৭৩	৬১১৩৪
কাশীপুর	৫৩০২৫	৬৬৬১৭

হাওড়া

বালি	৫১৬৫৬	৫১৯৫১
হাওড়া মধ্য	৬৯৬৭৩	৮৭৭৪৭
শিবপুর	৬৬৬৪৪	৭৫৩৫৫
হাওড়া দক্ষিণ	৭৩১১৫	৯৭৬৯৯
সাঁকরাইল	৭৫০১৯	৯৬১২৪
পাঁচলা	৬৯৩৩২	১০৩৫৬৭

কাঁথি

চণ্ডীপুর	৮৪১১০	৯৯৫৭৩
পটাশপুর	৮৪৪৫২	৯৮৮৫৪
কাঁথি উত্তর	৯১২৮১	১০৪১৫২
ভগবানপুর	৭৯৮০৬	১১৭১৯৭
খেজুরি	৯০৯৫৩	৯৬৫০৬
কাঁথি দক্ষিণ	৭৪৭৭৭	৯৩৭৯২
রামনগর	৯০৯২৭	৯৮৮৬৫

ঘাটাল

সবং	৮৮৬২৮	৯৪৭৯৮
পিংলা	৯৮০৬২	৯৯৭৬০
দাসপুর	৮৯৩০৬	৯৯২৪৬
ঘাটাল	৯৭৪৬৫	১০৩৩৩১
কেশপুর	৫২৯১৬	১৪৪৯৯০

বর্ধমান পূর্ব

রায়না	৫৮৩৩১	১১৩১৮০
জামালপুর	৭৮২৫৭	৮১৯৪১
কালনা	৮২৭২৪	৮৬৩৫৭
মেমারি	৮১৩৮৩	৮৬২৮২
পূর্বস্থলী দক্ষিণ	৭৮৩৩২	১০০২৪০
পূর্বস্থলী উত্তর	৮২৪৬৯	৮৫১৭৪

বর্ধমান দুর্গাপুর

বর্ধমান দক্ষিণ	৮৩৯৬৩	৮৫৩০১
মন্তেশ্বর	৬৭১৬৬	৯৫২০২
বর্ধমান উত্তর	৮০৬১৭	১০৮৬৬৩
ভাতার	৭২৯১৯	৯৯৩৮৩

উলুবেড়িয়া

উলুবেড়িয়া পূর্ব	৬৬৩৯১	৮৬১৭৯
উলুবেড়িয়া উ:	৬৮৮৮৮	৮২৮৭১
উলুবেড়িয় দ:	৭১৪৯৮	৯৬৪৪৫
শ্যামপুর	৭৬৫৭৩	১০৭৮৬৭
বাগনান	৬০৭৭৬	১০৯০৭০
আমতা	৬৬৭৮৫	১০৪২৫৯
উদয়নারায়ণপুর	৬৮১০৫	১০৭৯২৬

শ্রীরামপুর

জগৎবল্লভপুর	৮৮৬৪১	১০০৫৭১
ডোমজুড়	৭০৩৭৭	১২৫৪১০
উত্তরপাড়া	৭১৯৪৭	৭৫৪৩৮
চাঁপাদনি	৭৯০৭১	৮০৯৩০
চণ্ডীতলা	৭০৮৮৫	৮৮১০১
জাঙ্গিপাড়া	৮২০২৬	৯৩৯৫৮

ঝাড়গ্রাম

শালবনি	১০৩৭০৬	১১২৪৩১
বিনপুর	৭৩১৩৮	৭৬১৯৭

মেদিনীপুর

খড়্গাপুর	৮০২১০	৮৯৬৭৭

বোলপুর

কেতুগ্রাম	৭৫১৬৫	১০২৬৭৯
মঙ্গলকোট	৭৬১৭০	১০৫৩৯৭
আউসগ্রাম	৮০৫৯২	৯৫৪৬০
বোলপুর	৯০৫৬০	১০৬১৭২
নানুর	৯০৯৮৬	১০৮৭১৭
লাভপুর	৯০৭১২	৯৪৫১৫

হুগলী

চন্দননগর	৬৮৩২১	৭১১৯৬
ধনেখালি	৯৭৪৮০	১০৯৮৪২

পুরুলিয়া

মানবাজার	৮৩৩১৪	৯৩৮৯৭

বীরভূম

হাসন	৬১৪৪১	৯১৩৫১
নলহাটি	৬২৫৮৯	৯৮৯৭০
মুরারই	৪৮৮০৭	১১৮২১০

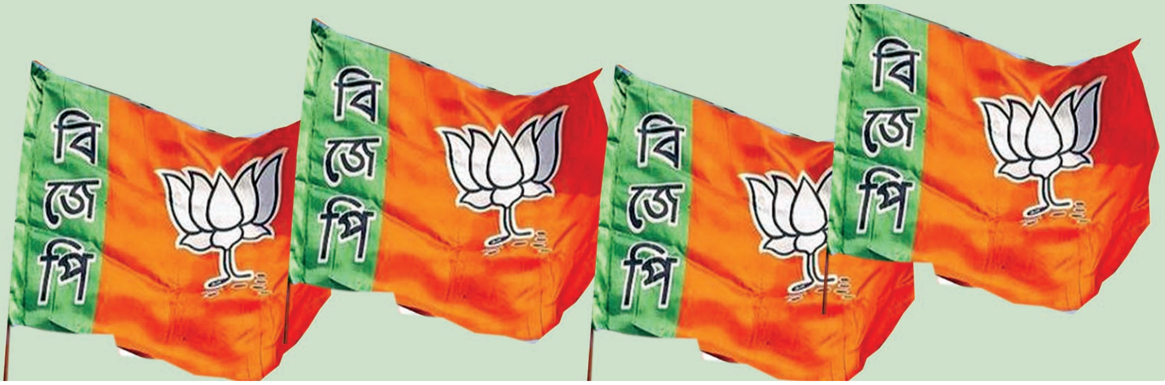

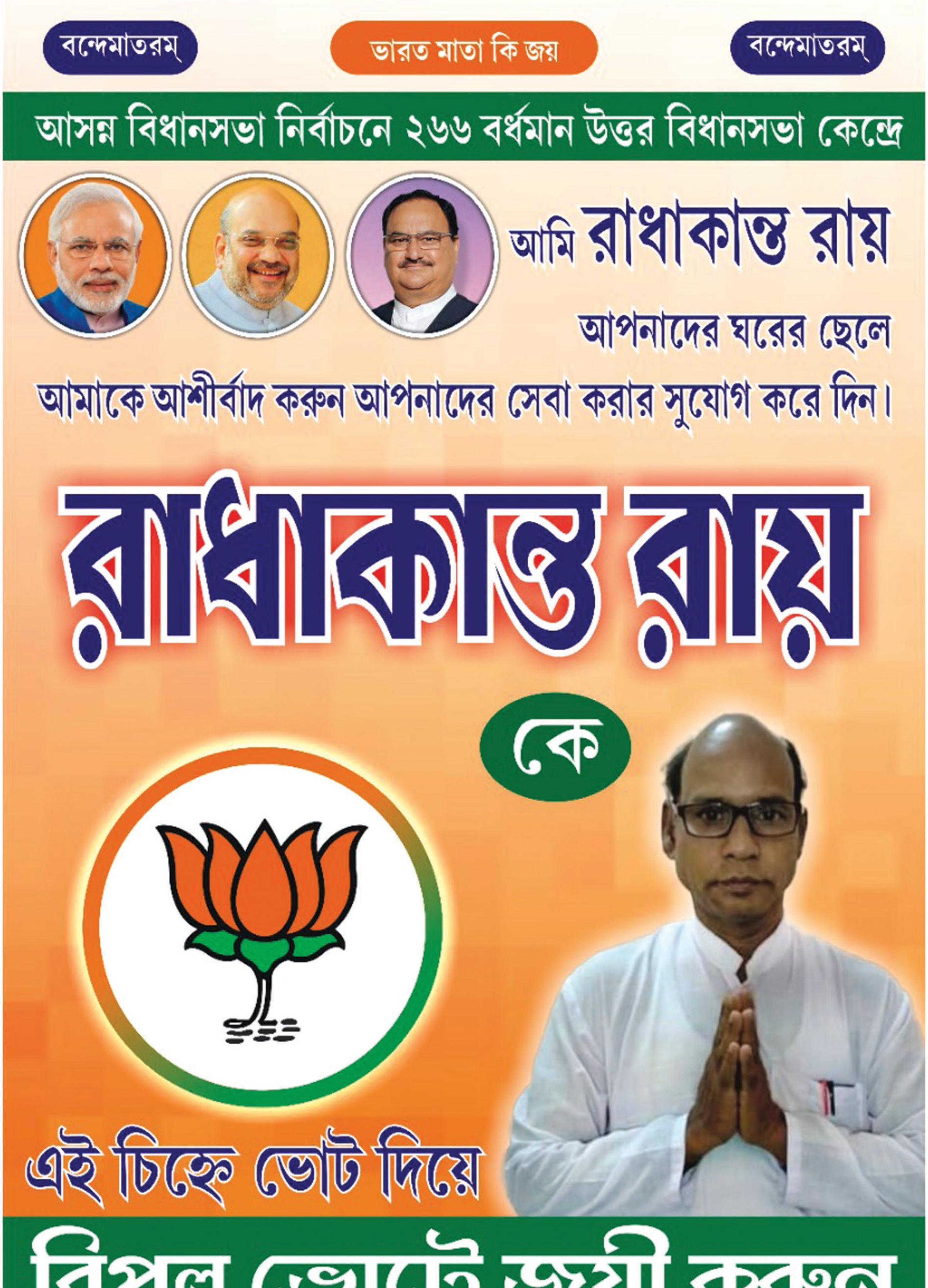
বন্দেমাতরম্
ভারত মাতা কি জয়
বন্দেমাতরম্
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৬৬ বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে
আমি রাধাকান্ত রায়
আপনাদের ঘরের ছেলে
আমাকে আশীর্বাদ করুন আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিন।
রাধাকান্ত রায়
কে
এই চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন

মাননীয়ার বহিরাগত তত্ত্ব ভয়ংকর সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিল বাঙ্গালিদের

ক্রিস্টোফার রক্ষিত

এবারের নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দলের একটি শব্দের কারণে সারা দেশে বিব্রত হতে হচ্ছে বাঙ্গালিদের। মাননীয়া এটা জানেন কি? হয় জানেন। নয়তো জানেন না। নির্বাচনী ফায়দা লুঠতে একটা বাঙ্গালিতত্ত্ব খাড়া করার পাশাপাশি গাঢ় ভাবে বহিরাগত তত্ত্ব এনেছেন নির্বাচনী লড়াইতে। কী সেই তত্ত্ব? আমাদের রাজ্যে বাঙ্গালি আর ভূমিপুত্র ছাড়া সবাই বহিরাগত। কিন্তু হাওয়া হয়ে গেছে সেই আমরা সবাই ভারতবাসী তত্ত্ব, সঙ্গে জাতীয় বোধের ভাবধারা। এই তত্ত্ব খাড়া করে প্রকারন্তরে কী ক্ষতি যে আপামর বাঙ্গালিদের করলেন সেটা কি ভেবেছেন মাননীয়া?

আমাদের রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ কাজের খাতিরে, নয়তো নানা কারণে অন্যরাজ্যে বাস করেন। এই বহিরাগত তত্ত্বকে সামনে রেখে নানা ভাবে হেনস্থা হতে হচ্ছে বাঙ্গালিদের। মাননীয়া খোঁজ নিয়ে দেখুন দক্ষিণ ভারতে, দিল্লি, উত্তর ভারতে নানাভাবে বাঙ্গালিদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। ব্যাঙ্কে গেলে যে কাজ অল্প সময়ে হয়ে যেত, বাঙ্গালি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হচ্ছে। সেখানে শুধুমাত্র পদবি দেখে সনাক্ত করার চেষ্টা করে, তাঁর আদি বাসস্থান জানা হচ্ছে। আর পরোক্ষে তাঁর গয়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে বহিরাগত তকমা। তিনি প্রতিবাদ করলে, আরও হেনস্থা করছে আমাদের এই বঙ্গের মানুষদের। মাননীয়া, আমরা ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নই। আমরা ভারতীয়রা একটি বৃহৎ জাতি। আপনি সেই জাতিকে বিভাজনের পথে ঠেলে দিলেন।

এবার আসি আরেকটি প্রসঙ্গে। আপনি ও আপনার আগের শাসন কর্তারা রাজ্যে কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। উলটে বাঙ্গলায় অন্য প্রদেশ থেকে যারা আসছে তাদের আপনি বহিরাগত তকমা লাগিয়ে দিয়ে, আমাদের রাজ্যের সেই নতুন প্রজন্ম, যারা রাজ্যের বাইরে গিয়ে সামান্য কাজের সুযোগ পেতেন, তাঁদের কফিনেও পেরেক পুতে দিলেন। এখন সারা দেশে একটি শব্দ চালু হয়ে গেল, সেটা বাঙ্গালি দেখলেই বহিরাগত বলে কাজ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতে শুরু করেছে। আপনি বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করে বাঙ্গালিদের একটা অভিশাপের মুখে ঠেলে দিলেন। এই অভিশাপ আপনি ভোগ করবেন না। করবেন সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, চাকরির সন্ধানে অন্যরাজ্যে যাওয়া উচ্চ শিক্ষিত সেই সব নতুন প্রজন্ম। যারা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। আপনি সেই সব বাবা-মা-কে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিলেন, যারা, তাঁদের সঞ্চয়ের সর্বস্ব দিয়ে, তাঁদের সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। যেটা আপনার ক্ষেত্রে ঘটেনি, আপনার পরম আত্মীয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেনি।

মাননীয়া, আপনি আপনার রাজ্যে আসা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বহিরাগত বলছেন। তাঁরা কেন বহিরাগত? একটু বলবেন? আপনিও তো সেই অর্থে বাঙ্গলা বাদে সারা দেশে বহিরাগত? সেটা হয়তো আপনার সংবিধানে আছে। কিন্তু আমাদের

এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করেন।

জাতীয়তাবোধে আপনি যে আঘাত করলেন, তাঁর শাস্তি আপনাকে কে দেবে জানি না। কিন্তু আপনার পাপের শাস্তি পেতে হবে আপামর রাজ্যবাসীকে। আপনার হীনমন্যতা আর নিজেরটা ছাড়া কিছু বুঝতে না পারার প্রচেষ্টা ভয়ানক ক্ষতি করে দিল বাঙ্গালিদের। আমরা সারা দেশের, সব রাজ্যের নাগরিকরা সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আর আপনি, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতাবাদের, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে বিশ্বাসী। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন প্রকৃত অর্থেই একজন রাষ্ট্রনায়ক। আপনি যেটা হাজার চেষ্টা করলেও আগামী একশো বছরে হতে পারবেন না। ফলে আমাদের রাজ্যের মানুষের যে ক্ষতি আপনি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য করে ফেললেন, সেই ক্ষতি সামলে উঠতে গোটা বাঙ্গালি জাতিকে সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। আপনি হয়তো মা-মাটি-মানুষের নেত্রী হয়ে সেটাই চেয়েছেন। □

থর মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া লুনি নদীর হদিশ

কৌশিক রায়

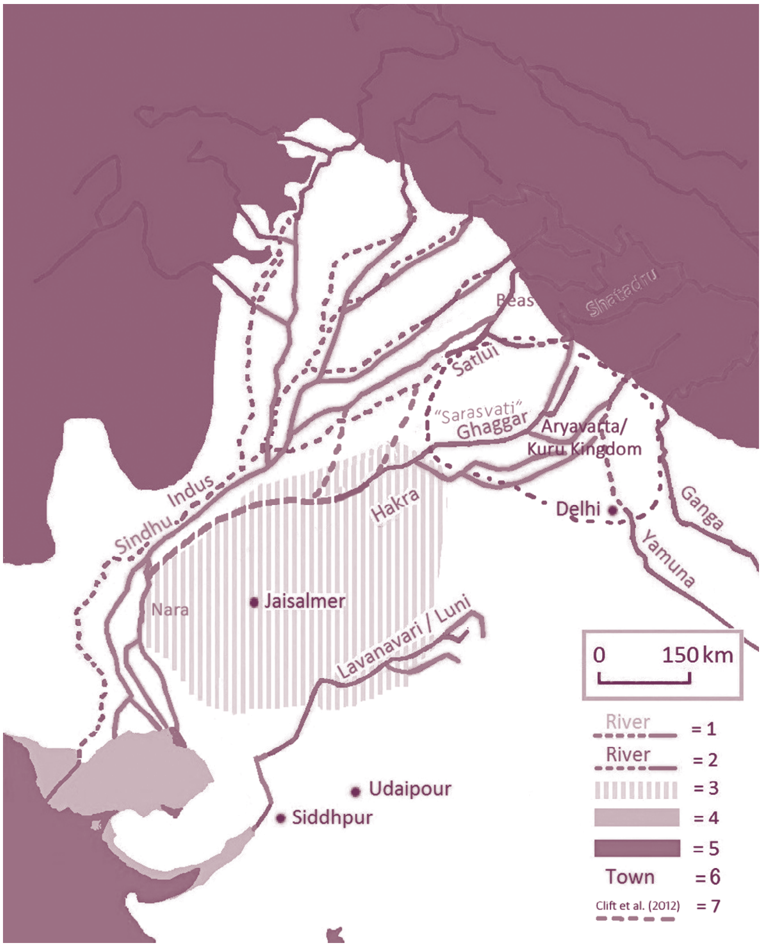

আফ্রিকার সাহারা, নুবিয়া, কালাহারি, মধ্য এশিয়ার ঝরা কুম ও কিজিল কুম, চিলি-র আতাকামা, আরব উপদ্বীপের রাআব আল-খালি, মার্কিন দেশের মোহাভে এবং লেছুগুইলা মরুভূমির মতোই রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাক জুড়ে, বালুকারশির শরীর নিয়ে পড়ে থাকা থর মরুভূমিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নির্জলা, বিশুদ্ধ, নির্দয়। ভারতীয় ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের সাক্ষী এই থর মরুভূমি। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী এবং হানাদারদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বীর ভারতীয় জওয়ানদের দেশপ্রেম ও রক্তপাতকেও আশ্রয় দিয়েছে এই থর মরু অঞ্চল। তবে, সম্প্রতি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাগৈতিহাসিক ভূগোলের এক ব্যতিক্রমী যোগসূত্র হয়ে দেখা দিয়েছে এই থর মরুভূমি।

আমরা ভূগোল বই পড়লেই জানবো— থর মরুস্থলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লুনি নদীটি এখন প্রায় অস্তিত্বহীন। তবে, সম্প্রতি জার্মানি ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট, চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ডরিসার্চ-এর একটি সম্মিলিত ভূ-গবেষক দল, রাজস্থানের বিকানীর শহরের কাজে অবস্থিত নল গ্রামটির পাথর, বালি ও কাঁকরের বিভিন্ন স্তর নিয়ে পরীক্ষার পর জানিয়েছেন— আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার বছর আগে এই থর মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হতো স্বচ্ছসলিলা, প্রশস্ত একটি প্রাণচঞ্চলা নদী। এই নদীর প্রবাহ এবং দুই তীরের উর্বর পলিমাটির ওপর নির্ভর করেই বর্তমানে প্রাণহীন থর মরুভূমিতে গড়ে উঠেছিল একটি সুসভ্য, সমৃদ্ধ জনপদ।

নল গ্রামের কাছে পাথর খাদানে শ্রমিকদের কাজ চলার সময় থর মরু অঞ্চলে একদা বয়ে যাওয়া এই স্রোতস্বিনীটির গতিরেখার সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা। তাঁদের এই একদা অস্তিত্বশীল নদীকে জানতে সাহায্য করেছে 'ল্যুমিনিসেন্স ডেটিং' নামক একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। এর ফলে থর মরুভূমিতে একদা প্রবাহিত নদীখাতের বালির কণার ভিতরে থাকা কোয়ার্টজ খনিজের মধ্যে সূর্যের আলো কতটা পড়েছিল— সেটা খতিয়ে দেখে ওই নদীর অস্তিত্বের বয়স নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ভারতের সবচেয়ে পুরোনো নদীগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হতো আজ থেকে ৮০-৯০ হাজার বছর আগে সজীব হয়ে থাকা লুনি নদীকে। পরবর্তীকালে, ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষার ফলে দক্ষিণ ভারতের মাহি, ওরসাং ও সবরমতী নদীগুলোর বয়স যে প্রায় লক্ষ বছরের কাছাকাছি সেটা জানতে পারা গেছে। তবে, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর ওশান ম্যানেজমেন্ট-এর অধ্যাপিকা হেমা অচ্যুতন জানিয়েছেন— থর মরুভূমির এই বিলুপ্ত নদীর হদিশ ভারতের ভৌগোলিক অন্বেষণকে একটা নতুন ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারে। ▯

অজন্তার গুহাচিত্রে (১৭) বিজয় সিংহের রাজ্যাভিষেক।

বঙ্গবীর বিজয় সিংহ

এক বিস্মৃত অতীত

প্রকাশ দাস

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

যার বিজয় সেনানী এমন হেলায় লঙ্কা জয় করেছিলেন তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন বঙ্গবীর বিজয় সিংহ। এই বিজয় সিংহ রাবণ রাজার রাজ্য জয় করে তার নাম দিয়েছিলেন 'সিংহল'। বঙ্গবাসী বিস্মৃত হলেও লঙ্কাবাসী আজও তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।'

লঙ্কা বা 'তাম্রপর্ণী' দ্বীপ ছিল বৃহত্তর ভারতের অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভারতের যে রূপচিত্র আভাসিত হয়েছে তার তৃতীয় ভাগ ছিল তাম্রপর্ণী বা বর্তমান শ্রীলঙ্কা— 'ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুমাংশ্চ তাম্রপরণো'। রামায়ণ পরবর্তী সময়ে বাল্মীকির এই অনিন্দ্যসুন্দর 'লঙ্কা' বিজয় সিংহের নেতৃত্বে কীভাবে 'সিংহল' দেশে পরিণত হলো প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দ্বীপবংশে' তার সুন্দর এক বিবরণ আছে (নবম অধ্যায়)।

রূপকথার উপকরণ পরিহার করে ঐতিহাসিকরা দেখেছেন যে ভগবান বুদ্ধের সময় বৃহত্তর বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল (এখনকার নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার পশ্চিম দিকের সমভূমি ও তরঙ্গায়িত ক্ষয়িষ্ণু উচ্চভূমি) রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। 'ভবিষ্য পুরাণ', 'অভিধান চিন্তামণি', 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। রাঢ় বঙ্গের রাজার সঙ্গে কলিঙ্গ রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছিল। তাদের অসাধারণ রূপসী একমাত্র কন্যার নাম ছিল সুসীমা। বিদ্রোহী বনচারীরা প্রায়ই রাঢ় বঙ্গে অতর্কিত আক্রমণ করত। কোনো এক সময় এদের নেতৃত্বে ছিলেন 'সিংহ' পদবিধারী এক বীর।

'রাঢ়' বা 'লাঢ়' বাঙ্গলার রাজদুহিতা 'সুসীমা' পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে 'সিংহ' উপাধিধারী সেই বীরকে বিয়ে করেছিলেন কিংবা সেই বীর তাকে প্রলুব্ধ করে বিয়ে করেছিলেন। রাজকুমারী রাজপরিবার ছেড়ে অরণ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অরণ্যভূমিতে নির্বাসিতা মায়ের গর্ভে বীরপুত্র 'সিংহবাহু' বা 'সীহবাহুর' জন্ম হয়েছিল। ছেলেবেলার অধিকাংশ সময় তিনি বনবাসীদের সাহচর্যে কাটিয়েছিলেন। বীরত্ব ছিল তার সহজাত।

সিংহবাহুর যখন ষোল বছর বয়স তখন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামহের সিংহাসনে আসীন হন (ঐতিহাসিকরা রাঢ়বঙ্গের রাজধানী হিসেবে 'সিংহপুর' বা এখনকার সিঙ্গুরকে চিহ্নিত করেন। এর কাছেই অবস্থিত সিংহের ভেড়ি গঙ্গার পরিত্যক্ত প্রবাহের চিহ্ন এখনো বহন করছে। অনুমান করা হয় যে তখন এখানে একটি বিখ্যাত নৌ-বন্দর ছিল যেখান থেকে সমুদ্র যাত্রা করা হতো)।

সিংহবাহুর জেষ্ঠ্যপুত্র ছিলেন বিজয় সিংহ। বিজয় প্রথম জীবনে খুবই দুরন্ত ও দুর্বিনীত ছিলেন। তাঁর ও সঙ্গীদের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে রাজা তাঁদের নির্বাসিত করেন। বিজয় অনেক সঙ্গী-সহ অর্ণবপোতে সমুদ্রের উপকূল বরাবর ভেসে ভেসে লঙ্কা দ্বীপে এসে পৌঁছলেন। আর সেই সময় তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রত্যাশায় মল্লরাজের শালবনে শায়িত ছিলেন। মুদিত নয়নে তিনি যেন দেখেছিলেন—

'বিজয়ো লাঢ়বিসয়া সীহবাহুনরিন্দ জো
এস লঙ্কং অনুপপত্তো সত্তভচ্চসতানুগো।'

অর্থাৎ সিংহবাহু-পুত্র বিজয় সাতশত অনুচর-সহ লাঢ় বা রাঢ় দেশ থেকে লঙ্কায় আসছে...(৪৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। মান্নার সাগরের উপকূলে অবস্থিত মাহাথিতা (এখন মান্তোতা) বন্দরে সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন বিজয় সিংহ। লঙ্কায় পৌঁছনোর পর কৌশল ও বাহুবলে বিজয় সেই রাজ্য জয় করেছিলেন। অজন্তার গুহাচিত্রে বিজয় সিংহের লঙ্কায় আগমনের একটি সুন্দর ছবি অঙ্কিত আছে (১৭নং)।

'কুবর্ণা' (কুবেনি) নামে লঙ্কার এক রাজদুহিতার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়ে বিজয় তাকে বিবাহ করলেন। তারপর কুবর্ণার সাহায্য নিয়েই লঙ্কার সেই সময়ের নাগবংশীয় রাজা কালসেনকে বধ করে লঙ্কা দ্বীপের রাজসিংহাসনে আসীন হলেন। 'Vijaya, the legndary Aryan conquerore of Ceylon, is said to have gairned the

Island by the sword'। পরে কুবর্ণা যখন তার দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়রা ষড়যন্ত্রকারিণী হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে হত্যা করে এবং তার দুই সন্তানকে নিয়ে তাদের গোপন পার্বত্য আস্তানায় আত্মগোপন করে।

এর পরে বিজয় এক পাণ্ড্য (দাক্ষিণাত্য) রাজদুহিতাকে বিয়ে করেছিলেন। যিনি বিজয়ের প্রধানা মহিষী ছিলেন। রাজকন্যাকে নিয়ে আসার জন্যে আমাত্যগণ অনেক রত্নলংকার ও উপঢৌকন-সহ মাদুরাইতে ('মধুরং পুরং') পাণ্ড্য রাজার কাছে গিয়েছিলেন। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তিনি প্রত্যেক বছর পাণ্ড্যরাজকে বহু অর্থ মূল্যের শঙ্খ-মুক্তা পাঠাতেন।

'...অদাসি সসুরসস তু অনুবসসং সঙ্খমুক্তং সতসহসসদ্বয়রহং।'

পাণ্ড্যরাজতনয়া অপুত্রকে ছিলেন বলে বিজয় নিজের ছোটো ভাই সুমিত্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরবর্তী শাসক হওয়ার জন্য।

'হিত্বান পুব্বচরিতং বিসমং সমেন
ধম্মেন লঙ্ক'মখিলং অনুসাসমানো
সো তম্বপণ্ণি নগরে বিজয়ো নরিন্দো
রজ্জং অকারয়ি সমাখলু অটঠতিংসাতি।।'

(পূর্বের অসৎ আচরণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মানুসারে সমগ্র লঙ্কা শাসন করিয়া বিজয় নরেন্দ্র তাম্রপর্ণী নগরে আটত্রিশ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন— 'মহাবংস'।)

বিজয়ের ভাই আসতে পারেননি। কারণ তাঁরও বয়স হয়েছিল। তাই এসেছিলেন তাঁর ছোটো ছেলে বাসুদেব। তিনি পৌঁছনোর আগেই বিজয় প্রয়াত হন (৪৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। বিজয়ের আমাত্যগণ বাসুদেবের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করলেন। বাসুদেবের মহিষী ছিলেন ভদ্রকাত্যায়নী। তিনিও ছিলেন দক্ষিণ ভারতের রাজকুমারী। এর পর বিজয় সিংহের বংশধররা বহুকাল যাবৎ সিংহল শাসন করেছিলেন।

বিজয় সিংহের বিজয়যাত্রা থেকেই বোঝা যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গবাসীরা ছিলেন নৌবিদ্যায় পারদর্শী ও যোদ্ধা। বিজয়ের অভিযান ও রাজ্য শাসনের ফলে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মূল ভারতভূমির নতুন করে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সম্রাট অশোক এবং সিংহল রাজ 'দেবনামপিয়' তিষ্যার নিবিড় মিত্রতায় তা আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বাঙ্গলার সঙ্গে সিংহলের যে এক সার্বিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তা বোঝা যায় সেখানকার স্থাপত্য-ভাস্কর্যে পাল ও সেন যুগের নির্মাণ শৈলীর প্রভাব থেকে। আর মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে পাওয়া যায় লঙ্কার সঙ্গে বণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ। ধনপতি সওদাগর সিংহল রাজকে বলছেন—

'বদল আশে নানা ধন আন্যছি সিংহলে
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে।।'

সিংহলের সংগীতেও বাংলাগানের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ওই দেশের জাতীয় সংগীতও 'জন গণ মন'র সুর অনুসরণ করে গাওয়া হয় ('শ্রীলঙ্কা মাতা, আপা শ্রীলঙ্কা নমো, নমো সুন্দর, শ্রীবরণি, সুরেন্দ্রি, অতিশোভমালা লঙ্কা ধন্য...')। শ্রীলঙ্কার প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ W.S.Karunatilake প্রমাণ করেছেন সিংহলী ভাষায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি বাংলা শব্দ রয়েছে।

সিংহলে বিজয় এতই স্মরণীয় ও লোকপ্রিয় ছিলেন যে ওই দেশের অনেক রাজার নামেই বিজয় শব্দটি থাকতো। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে মূর দস্যুদের হাতে নিহত রাজা সপ্তম বিজয়বাহু পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। 'আত্মঘাতী' ও আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালিরা একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারবে আজও শ্রীলঙ্কার ঘরে ঘরে কেন এত বিজয়। পরিতাপের বিষয় হলো যে, বাঙ্গালি শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রমে এই ঘটনাকে কাল্পনিক বলে অগ্রাহ্য করা হয়। মঙ্গলকাব্যের কাব্যশৈলী নির্ণয়ের জন্যে বাংলা ভাষা সাহিত্যে বিষয়টি পড়ানো হয়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়। অথচ শ্রীলঙ্কায় বিজয় সিংহের আগমন এক যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

কারণ ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ এবং বিজয় সিংহের লঙ্কায় পদার্পণ থেকেই শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস লিখিত হয়েছে ও বুদ্ধকালের সূচনা হয়েছে (৪৮৬ বিসি)। এই বিষয়ে পালি ভাষায় রচিত বিখ্যাত ও সুপ্রচীন বই দুটি হলো 'দ্বীপবংস' ও 'মহাবংস' যা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হয়। দ্বীপবংসে উল্লিখিত একটি সর্বগ্রাহ্য corner stone হল—

'দ্বে সতানি চ বস্পনি অটরস বস্পনি চ।
সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে অভিসিত্তে পিয়দসিসনো।।

অর্থাৎ মহাপরিনির্বাণের দুশো আঠেরো বছর পর সম্রাট প্রিয়দর্শীর অভিষেক সম্পন্ন হয়। সম্রাট অশোকের অভিষেক হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮-তে। বিস্মৃত বাঙ্গালির এবার সত্যিটা জানা প্রয়োজন। ▯

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে সিঁদুরে মেঘ

প্রণব দত্ত মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা জানেন যখন কোনো দেশে মুসলমানদের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে উঠে তখন এই হুজুর বা মুরুব্বিরা প্রকাশ্যে এসে রাজনৈতিক রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। তারা উপরে উপরে সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথাবার্তা বললেও তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হলো কোরান ও হাদিসের নির্দেশিত পথে 'দার-উল-ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না ত হলফ করে বলা যায়। আমাদের দেশভাগের সময়ও সেই ঘটনা ঘটেছে।

এই পিরের সন্তান আব্বাস সিদ্দিকি খুব চতুরতার সঙ্গে তার রাজনৈতিক দলের নাম রেখেছেন 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট'। ইনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির বঞ্চনার কথাবার্তা বলছেন প্রকাশ্য সমাবেশে। ভাবটা এমনই যে দেখুন আমি কত সেকুলার। হিন্দু মুসলমান সবার দুঃখদুর্দশার কথা আমি বলছি। এরা খুব চতুর খেলোয়াড়। আস্তিনের ভেতরের গোপন অ্যাজেন্ডাটি সঠিক সময়েই বের করবেন। যেহেতু এই পিরজাদা তার দলের নাম রেখেছেন 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট'; ব্যাস, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়া এবং তোষণকারী ভণ্ড সেকুলার কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে গিয়ে পিরজাদার হাত ধরলেন। তাকে নিয়ে বিগ্রেডে বড়ো সমাবেশও করলেন। সাম্প্রদায়িক বিজেপির হাত থেকে বাঁচার

কী অদ্ভুত যুক্তি বাম-কংগ্রেসের! তাঁরা বলছেন, আব্বাসের দল নাকি সেকুলার, কারণ তার দলের নাম 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট' এবং তিনি দলিত-সহ সব পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবি-দাওয়া তুলে ধরছেন। এ যেন কেউ যাত্রাপালায় রাজার বেশ পরে রাজার ডায়লগ দিলেই রাজা হয়ে যায়।

জন্য আল্লা যেন একজন সেকুলার নেতাকে তাদের শক্তি জোগাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের কথা ভাবছি। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার আগে এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন যখন কেন্দ্রে বা রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখন তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে বলত--- কংগ্রেস পুঁজিপতিদের দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তাদের কালোহাত গুঁড়িয়ে দাও ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর তারা কমিউনিস্টসুলভ হিংস্রতায় বহু কংগ্রেসিকে হত্যা করেছে। এখন এই দুই পার্টি প্রাণের বন্ধু। ধর্মকে কমিউনিস্টরা আফিংয়ের সঙ্গে তুলনা করে, তারাই আবার পিরের সন্তানকে ভালোবাসায় জাপটে ধরেন। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা সবসময়ই মুসলমান তোষণ করেছে। আসলে এরাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক পার্টি, এরা সবসময় মুসলমানদের হয়ে কথা বলে ও রাজনীতি করে। আর আমাদের হিন্দু দলিত ভাই-বোনেরা রাজনৈতিক বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। মুসলমান নেতারা তাদের সেকুলার ভাবমূর্তি গড়ার কৌশলে দলিত-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেন। দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের এই কৌশল ধরতে পারেন না। এখন দেখছি ভারতের হিন্দি বলয়ে তারা 'জয় ভিম জয় নিম' স্লোগান দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতি করছেন। স্বাধীনতার আগেও তাদের এই রাজনৈতিক বিভ্রম ছিল। তাদের এই রাজনৈতিক বিভ্রমের ব্যাপারে

ফঃ৫

অত্যন্ত জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ড. আম্বেদকর বলেছিলেন— 'তফশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল'। তিনি বলেছেন— 'বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের হিসেবেই গণ্য করে; ওদের মতে এই কাফেরদের রক্ষা করার চেয়ে মেরে ফেলাই উচিত'। ড. আম্বেদকর স্পষ্ট ভাবে বলেছেন--- 'মুসলমান রাজনীতিবিদরা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনযাত্রাকে তাদের রাজনীতির ভিত্তি বলে স্বীকার করে না'। কোরানের শিক্ষাই হলো দুনিয়া জুড়ে 'দার-উল-ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করা। ড. আম্বেদকরের 'PAKISTAN OR THE PARTITION OF INDIA' বইটিতে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আসাদুদ্দিন ওয়েসি ও আব্বাস সিদ্দিকির মধ্যে আমি ভবিষ্যতের জিন্না ও সুরবর্দির ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আব্বাস সিদ্দিকির কথাবার্তায় মুসলমান-সহ অন্যান্য পিছিয়ে পড়া হিন্দু জনগোষ্ঠীর কথা শুনে, তাকে সেকুলার ভেবে যে হিন্দুরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে জোট করতে এগিয়ে যাচ্ছেন তারা যে ভুল করছেন তা বোঝাবার জন্য স্বাধীনতার আগে ঘটা এইরকম ঐতিহাসিক ভুলের কথা মনে করে দেব যার জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে জান মান সবই খোয়াতে হয়েছিল।

১৯৩৭ নাগাদ ব্রিটিশ সরকার ঠিক করেছিল ভারতের প্রদেশগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের কিছু ক্ষমতা দেওয়া হবে। তার জন্য তারা দুটি আইন প্রণয়ন করেছিল। Communal Award-1932 ও Govt. of India Act-1935। Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কানুনটি হলো ভারতের প্রাদেশিক সভাগুলিতে প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা ঠিক হবে সেই প্রদেশগুলির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যেমন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, তফশিলি জাতি উপজাতি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গ্রুপ, ইউরোপিয়ান গ্রুপ ইত্যাদি জনসংখ্যার অনুপাতে। এটা আসলে ছিল ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির একটি কৌশল। সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব ব্যাপারটাই ইংরেজদের মস্তিষ্ক প্রসূত। এর মাধ্যমে মুসলমানদের গুরুত্ব বাড়িয়ে কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে চাপে রাখার কৌশলও ছিল এতে।

যাই হোক, অবিভক্ত বাঙ্গলায় সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব (এখন যাদের দলিত বলা হয়)-দের নেতা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রিধারী। রাজনৈতিক উচ্চকাঙ্ক্ষার কারণে তিনি 'বঙ্গীয় তফশিলি ফেডারেশন' নামক রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনীতির আঙিনায় নেমে পড়েন ১৯৩৭ সালে।

মুসলিম লিগ নেতা আলি জিন্না ছিলেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। তিনি নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য মুসলমানদের অধিকারের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবদের অধিকারের কথাও বলতেন আব্বাস বা ওয়েসি এখন যা করছেন। জিন্না তো কংগ্রেসকে বর্ণ হিন্দুদের দল বলতেন এবং গান্ধীজীকে তাদেরই নেতা বলতেন। জিন্নার ফাঁদে পড়ে গেলেন যোগেন মণ্ডল। কারণ তিনি বর্ণ হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন মুসলমান আর তফশিলিদের সামাজিক অবস্থান একই। উভয়কে একসঙ্গে লড়াই করে বর্ণ হিন্দুদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে এবং এভাবেই তফশিলি জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। মুসলমানদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করার কারণে তিনি জিন্নার মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তিনি বলতেন--- 'তফশিলি জাতি হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া ঘৃণিত জীবনযাপন করার চেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোনো জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে পছন্দ করে'। তখন অবিভক্ত বাঙ্গলায় তফশিলি জাতি/উপজাতির ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক দরকষাকষির সহায়ক হয়েছিল। জিন্না ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজনৈতিক দরকষাকষির সময় বলতেন তিনি মুসলমান ও তফশিলি জাতি/উপজাতি মিলিয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই বর্ণ হিন্দুদের দল কংগ্রেস ও তার নেতা গান্ধীর কথা শুধু শুনলে চলবে না তাঁর কথারও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এইভাবে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে জিন্না ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের রাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তখন অবিভক্ত বাঙ্গলায় মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় কয়েক পারসেন্ট বেশি ছিল। সুরাবর্দির মন্ত্রী সভায় মন্ত্রিত্বের পদ দেওয়া হয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ভারতবাসীকে দেখাবার জন্য যে দেখ আমরা মুসলমানরা দলিতদের কত সম্মান করি, ভালোবাসি।

নানারকম রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে আসে বিভিন্ন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটির সঠিক রূপরেখা তৈরি করার জন্য। জিন্না ১৯৪০ সালে লাহোরে নেওয়া মুসলিম লিগের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তানের দাবিতে অনড় রইলেন। কমিউনিস্টরা তাদের Right to self determination অর্থাৎ 'প্রত্যেক জতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে' এই তত্ত্বের মোড়কে জিন্নার দাবির পক্ষে জোরালো সওয়াল করে দাবির পক্ষে জনমত গড়তে লেগে গেলেন। মুসলিম লিগের এই দাবিকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন তফশিলি নেতা যোগেন মণ্ডল। আজকের পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৪৬-এর রাজনীতির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। জিন্না পরিস্থিতি বুঝে তার শেষ চালটা দিলেন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী। তিনি বললেন ১৫ আগস্ট (১৯৪৬)-এর মধ্যে তাকে জানাতে হবে যে তার পাকিস্তান দাবি মানা হবে কিনা, তা না হলে তিনি ১৬ আগস্ট থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করে তিনি তার

দাবি আদায় করে নেবেন। তখন ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হিন্দুরা বুঝতেই পারেনি এই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মানে কী। এটি আসলে ছিল একটি চতুর শব্দবন্ধের আড়ালে ইসলামিক 'জিহাদ'। জিহাদ করা মানে ইসলামের অনুসারীরা অমুসলমানদের মেরে-কেটে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ধর্ষণ করে, ধর্মান্তর করে বা অন্য যে কোনো উপায়েই হোক ইসলামের রাজত্ব কায়েম করবে। এটাই আল্লার নির্দেশ আর এটাই তাদের একমাত্র পবিত্র কাজ। 'দার-উল-হারব'কে 'দার-উল-ইসলাম'-এ পরিণত করা। ইসলামের এই তত্ত্বের কথা ১৯৪৫ সালে ড. আম্বেদকর তার বই 'PAKISTAN OR PARITION OF INDIA'-তে আলোচনা করেছিলেন। 'দার-উল-হারব' হলো সেই সমস্ত দেশ যেখানে ইসলামের শাসন কায়েম করার জন্য লড়াই চলছে। যাই হোক, জিন্নার এই হুমকিকে সর্ব ধর্মের প্রতি প্রেম বিতরণকারী (অন্য ধর্মকে বিশেষ ভাবে না জেনেই) হিন্দুরা বিশেষ করে গান্ধীবাদী কংগ্রেসের কোনো আমলই দিল না। মুসলমানরা কিন্তু তাদের লক্ষ্য স্থির করে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। বাঙ্গলার মসনদে তখন মুসলিম লিগের সুরাবর্দি, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়ররের মসনদে মুসলিম লিগের নেতা এসএন ওসমান। সুতরাং এর থেকে ভালো পরিস্থিতি আর কী হতে পারে? কাজেই ঠিক হলো ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মোক্ষম আঘাতটা কলকাতাতেই হানতে হবে।

৪৬-এর ১৬ আগস্ট এসে গেল। জিন্নার দাবির কোনো গুরুত্ব দেওয়া হলো না। দিনটা ছিল রমজান মাসের শুক্রবার। মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র মাসের পবিত্র দিন। আমাদের ধারণা এই পবিত্র মাসে মুসলমানরা রোজা রেখে উপোস করে কত পবিত্র কাজ করে। কিন্তু ওদের পবিত্র কাজের ধরনটা তো অন্য। ইসলামের ইতিহাস ঘাটার অভ্যাস থাকলে দেখবেন নবি মহম্মদ 'বদরের যুদ্ধ' (ইসলামের ইদিহাসে প্রথম জিহাদ) করার জন্য এই পবিত্র মাসটিকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন। সেজন্য মুসলমানরা জিহাদ করার জন্য পবিত্র রমজান মাসকে বেছে নেয়। ওইদিন সকালের নামাজের পর কলকাতার বুকে নেমে আসে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' নামক ভয়াবহ হিন্দু হত্যালীলা। তিনদিন ধরে কলকাতার বুক জুড়ে হিন্দুদের উপর চলেছিল লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, হত্যা, হিন্দুনারীর ইজ্জত লুণ্ঠন ইত্যাদি পৈশাচিক কাজ। প্রায় ৫ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল আহত হয়েছিল প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। ইতিহাসে এই ঘটনা দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস নামে অভিহিত হয়ে আছে। কংগ্রেসের নেতা জওহরলাল এটিকে একটি বিক্ষিপ্ত ছোটো ঘটনা বলেছিলেন। প্রেমের অবতার গান্ধীজী আশ্চর্য রকমের নীরব ছিলেন। আমাদের মুসলমান- দলিত ভাইয়ের নেতা যোগেন মণ্ডল বললেন— এই দাঙ্গা মুসলমান আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে হয়েছে তফশিলিদের বিরুদ্ধে হয়নি, সুতরাং তাঁর কিছু বলার নেই। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ যোগেনবাবু জানতেন না ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করছে।

এই ভয়াবহ ঘটনার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় সুরাবর্দি সরকারের উপরে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানে সুরাবর্দি সরকারের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি তাঁর দলের তফশিলি প্রতিনিধি, কংগ্রেস থেকে ভাঙিয়ে আনা চারজন তফশিলি প্রতিনিধি এবং চারজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিনিধির সমর্থন জোগাড় করে সুরাবর্দি সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে হিন্দুদের ভাগ্যে নেমে আসে আরও অন্ধকার। পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে কোনো উত্তর মিলছে না দেখে অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রিমিয়ার সুরাবর্দি হিন্দুদের উপর আবার জিহাদ করার মনস্থ করলেন। মনে রাখবেন 'সুরাবর্দি'রা হলো সুফি সিলসিলার লোক। আমাদের কিছু ধারণা আছে যে সুফিরা হলো খুব নরমপন্থী ধর্মপ্রাণ লোক। গান-বাজনা কাওয়ালি ইত্যাদি নিয়ে থাকেন। আমরাও সুফিদের নামে প্রেমে গদ গদ হয়ে যাই। আসলে সুফি সিলসিলার লোকেরা ইসলামের প্রসারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভারত ভাগের ব্যাপারেও তাদের মুখ্য ভূমিক ছিল। এ ব্যাপারে সঞ্জয় দিক্ষিতের UNBREAKING INDIA বইটি পড়ে দেখা যেতে পারে। যাই হোক এবার জেহাদের দিন ঠিক হলো ১০ অক্টোবর (১৯৪৬) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। স্থান নির্বাচিত হলো তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (এখনকার বাংলাদেশ) নোয়াখালী। এখানেও জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এক পিরজাদা, মুসলিম লিগের উঠতি উগ্র নেতা গোলাম সরওয়ার। নদী-নালা খাল-বিলে ভরা নোয়াখালিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট মন্দির ইত্যাদি জ্বালিয়ে পুলিয়ে খাক করে দেওয়া হয়েছিল। হিন্দু মেয়েদের লুট করে ধর্ষণ করে জোর করে বিয়ে করে তাদের সতীত্বের দফারফা করে দেওয়া হলো; আর হয়েছিল ব্যাপক ভাবে ধর্মান্তরকরণ; এবং ধর্মান্তর করে জোর করে গোরুর মাংস খাওয়ানো হয় ইসলাম গ্রহণ না হয় মৃত্যুবরণ। বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। এক কথায় নোয়াখালীর হিন্দুদের জীবনে নেমে এসেছিল ভয়াবহ নরক যন্ত্রণা। ইতিহাসে এই নারকীয় ঘটনাকে 'Noakhali Genocide' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবার গান্ধীজীর টনক নড়ে গেল। তিনি ছুটে গেলেন নোয়াখালিতে তাঁর অহিংসার বার্তা নিয়ে। তাঁর অহিংসার বার্তা দুর্বল হিন্দুদের উপরই কাজ করতো। মুসলমানরা তার বার্তাকে পরোয়া করত না কখনই। কারণ ইসলামের দর্শনে কাফেরদের প্রতি প্রেম দেখানোর কোনো শিক্ষাই নেই; এবং তা তাদের ধর্ম অনুমোদন করে না।

অবশেষে গান্ধজী ও তার অনুগত কংগ্রেস জিন্নার দাবির কাছে নতজানু হলেন। দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত হলো। ভারতবর্ষের পূর্বদিকের এবং পশ্চিম দিকের মুসলমান অধুষিত অংশ কেটে গঠিত হয় মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান। পূর্ব দিকের অংশটির নাম পূর্ব পাকিস্তান (এখন যার নাম বাংলাদেশ) আর পশ্চিম দিকের অংশটির নাম হয় পশ্চিম পাকিস্তান। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসেছিল ১০ আগস্ট। জিন্না বিশ্ববাসীর কাছে নিজের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল রাখার জন্য

মুসলিম লিগের একনিষ্ঠ সেবক দলিতনেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে। আবেগে আপ্লুত যোগেন মণ্ডল ১০ আগস্ট পাকিস্তানের গণপরিষদের বৈঠকে তাঁর ভাষণে জিন্নাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিবিদ এবং মহত্তম ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেন। ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই মুচকি হেসেছিলেন।

মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান তো গঠিত হয়ে গেল। এবার তারা শুরু করল 'দার-উল-ইসলাম'-এর পরবর্তী ধাপের কাজ। অমুসলিমদের (কাফের) হয় মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে হবে, নয়তো তাঁদের মেরে ফেলতে হবে অথবা ওদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে অথবা জিম্মি হয়ে জিজিয়া কর দিয়ে গোরু-ছাগলের মতো ওদের বদান্যতায় বেঁচে থাকতে হবে; কাফেরের মেয়েরা ধর্ষণ করা ওই ধর্মে ছাড় আছে। এটাই ইসলামি দেশের রেওয়াজ। আর কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং পাকিস্তানের উভয় অংশেই শুরু হলো ব্যাপক ভাবে Ethnic Cleansing-এর কাজ। ১৯৫০ সালে এই কাজটি শুরু হলো ব্যাপক মাত্রায় বিশেষ করে পূর্ব বাঙ্গলায়। হিন্দুরা জান মান রক্ষা করার জন্য দলে দলে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে লাগলো। এবার কিন্তু ওরা আর দলিতদের ছাড় দিল না। কারণ এখন আর ওদের সাপোর্টের কোনো প্রয়োজন নেই। যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী হয়েও তার জাতের মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে পারছেন না। তার সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রাণ বাঁচাতে পারছেন না মুসলমানদের হাত থেকে। ভারতের দিকে উদ্বাস্তুর ঢল নামল। পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করলো। এই অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ করে দু' দেশের শান্তির জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করেন ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল। এই চুক্তির নাম 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি। এই চুক্তির ফলে ঠিক হয় উভয় দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের যাবতীয় নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন। সংখ্যালঘুরা যাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দেশ ত্যাগ না করেন এবং যারা ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন তারা যাতে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারেন সেটা উভয় দেশের সরকার সুনিশ্চিত করবেন। এই চুক্তি হওয়ার ফলে যোগেন মণ্ডল ভাবলেন এই চুক্তির যথাযথ প্রয়োগ করে পাকিস্তানে হিন্দুদের বিশেষ করে তার জাতভাইদের বাঁচাতে পারবেন। তাই তিনি নানারকম প্রস্তাব নানারকম সুপারিশ নিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে তাঁর তৎপরতা দেখাতে লাগলেন। হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য যোগেন মণ্ডলের এই তৎপরতা দেখে পাকিস্তান সরকার ভয়ানক বিরক্ত হলো। পাক সরকার তাকে হুমকি দিয়ে বলল এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ফল খুব খারাপ হবে। ঝানু রাজনীতিবিদ যোগেনবাবু বিপদের আঁচ পেলেন। বুঝলেন পাকিস্তানের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে এবং হয়তো এবার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতে পারে। তাই তিনি ভারতে পাঠরত তার অসুস্থ ছেলেকে দেখতে আসার ছল করে ভারতে পালিয়ে আসেন এবং ভারতবর্ষ থেকে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। তাঁর পদত্যাগ পত্রটি দীর্ঘ এবং মুসলমানদের বিশ্বাস করে তিনি যে কি ভুল করেছেন সেই অনুতাপ ও বেদনা সেই চিঠির ছত্রে ছত্রে রয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন— 'দীর্ঘ বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পাকিস্তান হিন্দুদের বসবাসের উপযুক্ত নয়। উচ্চবংশীয় এবং রাজনৈতিক ভাবে সচেতন তফশিলি গোষ্ঠীভুক্ত অনেক লোক ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। যে সকল অভিশপ্ত হিন্দু পাকিস্তানে থেকে যাবে, আমার আশঙ্কা ধীরে ধীরে পরিকল্পনামাফিক তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হবে নয়তো তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে'।

এই তো মুসলমান-দলিত ভাই ভাইয়ের পরিণতি। যে কমিউনিস্টরা জিন্নার পাকিস্তানের দাবির সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিল তাদের কী পরিণতি হয়েছিল? মার্কসবাদের কোনো জায়গা মক্কাবাদীদের কাছে নেই। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাজশাহী জেলার নাচোলে ১৯৪৯-৫০ সালে কমিউনিস্টরা একটা কৃষক বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল তাতে ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র। কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার অপরাধে ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহীর কারাগারে কমরেড শিবেন রায়, বিজন সেন, সুধীন ধর, কম্পারাম সিংহ-সহ ৭ জনকে হত্যা করা হয়। ইলা মিত্রকে বন্দি করে তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। সেই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন--- 'কিছু হিন্দু সন্ত্রাসবাদীর প্ররোচনায় কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী কমিউনিস্ট এবং স্বাধীনতা-বিরোধী ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানের দুশমনি করছিল এবং তারই দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে'। ছোটো-বড়ো সব কমিউনিস্ট নেতাই পাকিস্তানে ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে আবার বিপুল উদ্যমে মার্কসবাদের নামে মানুষের মগজধোলাই করে ভারতে তাঁদের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক ব্রিগেডের মিটিংয়ে কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে মৌলবাদী পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বক্তব্য রেখেছে। কংগ্রেসও তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কী অদ্ভুত যুক্তি তাঁদের, আব্বাসের দল নাকি সেকুলার, কারণ তার দলের নাম 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট' এবং তিনি দলিত-সহ সব পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবি-দাওয়া তুলে ধরছেন। যেন কেউ যাত্রাপালায় রাজার বেশ পরে রাজার ডায়লগ দিলেই রাজা হয়ে যায়। পিরের সন্তান যারা দিনরাত কাফেরদের ধ্বংস কামনা করে তারা হয়ে গেল সেকুলার! পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশের অংশ করার ইসলামি চক্রান্ত স্বাধীনতার পর থেকেই চলছে। ইতিহাসের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আকাশে ৪৬-এর সিঁদুরে মেঘ উঁকি মারছে। তাই এবার বিধান সভা ভোটে হিন্দুদের ভেবেচিন্তেই নিজের ভোটটি দিতে হবে।

অন্য নোটা

দুর্গাপদ ঘোষ

নির্বাচন বলে কথা! ভোট হবে অথচ প্রচার করা যাবে না, শহর হোক, গ্রাম হোক দলে দলে যোগ দিন, চলছে না চলবে না, মানছি না মানবো না, অমুকের তমুক হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, আমাদের নেতার পায়ে চোট আমরা তাঁর ল্যাংবোট এবং আরও কতসব যেমন ফলনা নিজের মেয়েকে চায়, কে না পরের ছেলেকে চায়, বংশবাদ, জিন্দাবাদ, জাতীয়তাবাদ মুর্দাবাদ, এতদিন ওরা এই করেছে ওই করেছে, আমরা এলে হ্যান করেঙ্গে ত্যান করেঙ্গে, জয় শ্রীরাম, এই কে রে তুই? দেখে নেব, বুঝে নেব, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বদলা নেব ইত্যাদি গলাবাজি, ভাঁওতাবাজি করা চলবে না, এমনকী কোনো পার্টির কোনো নেতাই জবাফুল চোখো শুম্ভ-নিশুম্ভ, চণ্ডমুণ্ডদের নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকতে পারবে না— এমন ভাবা যায়! কার ঘাড়ে কটা মুণ্ডু আছে যে এসব গণতান্ত্রিক অধিকারে, মৌলিক অধিকারে ব্যাগড়া দেবে! পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে, রং-বেরঙের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, ফ্লেক্স, কাটআউট, সিম্বল, দরমার বেড়া, পাঁচিল, দেওয়াল দখল না করে আবার ভোট হয় নাকি! কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে বুথ দখল, বাক্স বগল এখন নাই বা করা হলো, ছাপ্পা ভোটটোট না হয় একটু ঘেঁটে গেল, নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় কাউকে পছন্দ না হলে 'নোটা' (নন অন দ্য অ্যাভাব) বোতামে কেউ কেউ না হয় টিপে দিল, তাই বলে কোনো একটা গোটা এলাকায় নো এন্ট্রি টু এনিবডি! এতো একেবারে অন্যরকম 'নোটা'! পাড়াশুদ্ধ ভোট বয়কট করবে না, যার যাকে পছন্দ ভোট দেবে অথচ পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে কোনও নেতাকে ঢুকতে দেবে না, মাইক বাজিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে দেবে না, দুয়ারে দুয়ারে সরকার মাথায় করে হৃদয়ে বিষ-বিদ্বেষের ছুরি লুকিয়ে মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রের হাসি-হাসি, গদ-গদ মুখ দেখানো যাবে না— এমন কোনো জায়গা এখন এই ভু-ভারতে কোথাও আছে নাকি!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। সেখানে বিগত তিন পুরুষ ধরে স্যাঙাত বাহিনী নিয়ে তো নয়ই, কোনও নেতাকে এমনকী একাও ঢুকতে দেওয়া হয় না। সবাই সাধুপুরুষ, সবাই তোমরা খুব জনদরদি মানুষ বাপু, কিন্তু গ্রাম থেকে তফাত যাও। যা বলার বড়ো রাস্তা থেকে গ্রামে ঢোকার রাস্তার মোড়ে বলো। গ্রামের মধ্যে এক পা-ও বাড়িও না বাছাধনেরা। তোমাদের সবার জন্যেই গ্রামে ঢোকা নিষেধ।

এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন গ্রামের সদাচারী বর্ষীয়ানরা। এ গ্রামে তাঁদের কথাই শেষ কথা। তাঁদের জন্য তিন পুরুষের কস্মিনকালেও গ্রামের কাউকে কখনো থানা পুলিশের মুখ দেখতে হয়নি। কিন্তু গ্রামের কে কাকে ভোট দেবে তা নিয়ে বর্ষীয়ানদের কোনো মত নেই, রায় নেই, নেই কোনো ফতোয়া। গ্রামের মানুষ বাইরে যায়, কাজকর্ম করে খায়, কাগজ পড়ে, রেডিয়ো শোনে, টিভি দেখে। যার যাকে পছন্দ ভোট দেয়। গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার সেখানে সমহিমায় বিরাজিত। রাজি নয় শুধু নেতাদের হই-জোক্কার, মাইক-স্লোগানের দৌরাত্ম্য বরদাস্ত করতে। সব পার্টির সব নেতা এটা জানে। আর এও জানে সে অনেক বছরের এই প্রথা যে ভাঙবে এই গ্রাম থেকে সে একটা ভোটও পাবে না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও এখানে এই অন্যরকম 'নোটা'।

গ্রামের নাম ওথাবীরু। তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের কাছে। গ্রামে প্রায় ২৫০ টা বাড়িতে ৬৫০ জনের মতো ভোটার। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা— সব নির্বাচনেই তাঁরা ভোট দেন। প্রত্যেক বার গড়ে প্রায় ৯০ শতাংশ ভোটও পড়ে। কিন্তু...ভোটের সময় ওই কিন্তুটাই সবার চোখ ছাড়াবড়া করে দেয়। ভোট প্রচারে কোনো নেতা এলে গ্রামের মাথারা দল নির্বিশেষে গ্রামীণ রাস্তার ওই মোড়ে গিয়ে তাঁদের গলায় শাল জড়িয়ে নমস্কার করে স্বাগত জানায় এবং প্রতিশ্রুতির কল্পতরুদের বক্তব্য শুনে পত্রপাট বিদায় করে দেয়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাই মানুষে-মানুষে বিরোধ বাধানোর গুরুমশাই, যত নষ্টের গোড়া। সেজন্য এই গ্রামে তাদের সবারই প্রবেশ নিষেধ। অ্যালাউড 'নট এনিবডি'—নোটা। ▯

লোকশিক্ষা

এক রাজকুমারীর কথা

এক দেশে এক রাজকুমারী ছিল। তার মাঝে মাঝে খুব মনোকষ্ট হতো। তখন সে লুকিয়ে কাঁদতে থাকত। কেঁদে কেঁদে মন হালকা হয়ে গেলে বাইতে আসত। এমনিতে রাজকুমারী খুব শান্ত প্রকৃতির ছিল। কিন্তু তার রাগও হতো। তখন সে অনেক কষ্ট করে তার রাগ চাপা দিয়ে রাখত। ছোটো হলেও সে অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করত। রাজকন্যা বড়ো হতে হতে বুঝতে পারল হিংসা, রাগ, কান্না, হাসি, ভালোবাসা সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল, সবকিছুই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানিয়ে নিতে হবে। রাজকন্যা সেভাবেই সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ভগবানের কাছে রাজকুমারী শুধু নিজের জন্য নয়, পৃথিবীর সব মানুষ যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করত।

রাজপ্রাসাদের বাইরে তাদের প্রজারা কেমন আছে তা দেখার জন্য রাজকুমারী একদিন ছদ্মবেশে রাজমহলের বাইরে এল। প্রথমেই এক বোবা মানুষকে দেখতে পেল। লোকটি রাজকুারীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। রাজকুমারী তাকে নিঃশব্দে একটি সোনার মুদ্রা দিল। মুদ্রাটি পেয়ে লোকটি খুব খুশি হলো। অনেক সময় ধরে সে এরকম বহু গরিব, দুঃখী মানুষের দেখা পেল। তাদের সবাইকে সোনার মুদ্রা দিল। এসব দেখতে দেখতে রাজকুমারীর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। রাজমহলে ফিরে সে খুব কান্নাকাটি করল। তারপর মন একটু হালকা হলে অস্ফুটে বলল—ভগবান, তুমি তো সবার ঠাকুর। এদের আর কষ্ট দিয়ো না। যদি কষ্ট দাও তাহলে সবাইক সমানভাবেই দাও। নইলে সবাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।

তারপর রাজকুারী ভাবল গরিব প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘরেব জন্য তার বাবাকে বলবে। কিন্তু সে তো এখন খুব ছোটো। রাজামশাই তার কথায় গুরুত্বই দেবেন না। এদিকে রানিমা জানতে পেরে গেছেন যে রাজকুমারী একা একা বাইরে গিয়েছিল, তাই খুব রেগে গিয়েছেন। কাউকে কিছুই না বলে রাজকুমারী শান্তভাবে পড়তে বসল। পড়ায় তার মন ছিল না। সে কাগজ-কলম নিয়ে তার এত বছরের অভিজ্ঞতা, চাওয়া-পাওয়া, প্রজাদের দুঃখদুর্দাশা সবকিছুই লিখে ফেলল। সে ভাবল তার এই ছোট্ট বয়সের অভিজ্ঞতা যদি সবাই জানতে পারে তাহলে সবাই নাহলেও কিছু মানুষ গরিব দুঃখীদের জন্য সেবার হাত বাড়িয়ে দেবে। সে চুপি চুপি মন্ত্রীমশাইকে ডেকে তাঁর হাতে লেখাখানা দিয়ে বলল যে তার এই লেখাটি যেন রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করা হয়।

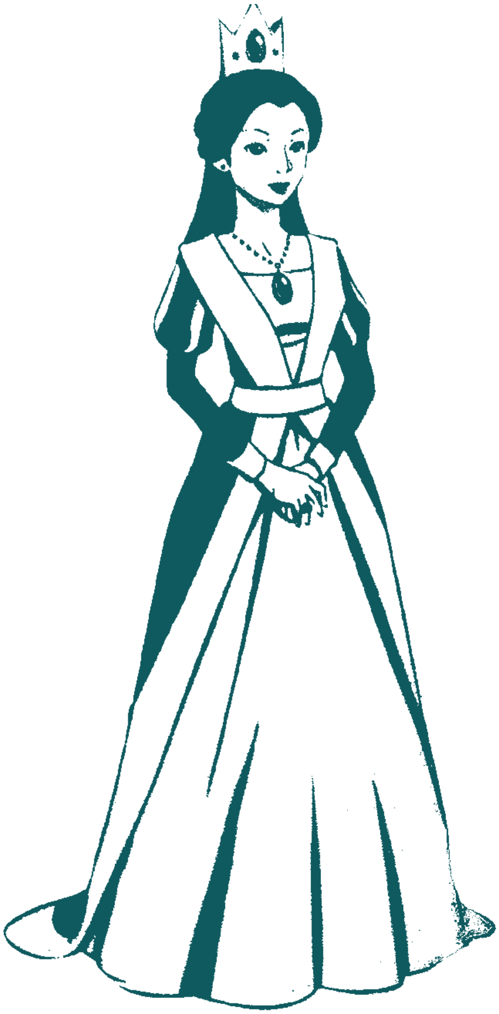

মন্ত্রীমশাই রাজকুমারীর কথা পালন করলেন। রাজকুমারী জানতে পারল রাজ্যে গরিব-দুঃখীদের আর কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। রাজ্যের সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজকুমারীর মনও ভালো হয়ে গেল। তার আর কষ্ট হয় না, কান্না পায় না। রাজকুমারীর ছোটো বয়সে বড়ো মনের খবর পেয়ে রাজ্যের সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজা ও রানি আদরে আদরে রাজকুমারীকে ভরিয়ে দিলেন।

অর্পিতা মজুমদাব

ভারতের পথে পথে

গুলমার্গ

অতীতের গৌরীমার্গ বর্তমানে গুলমার্গ নামে পরিচিত। কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ শা এর নাম বদল করে গুলমার্গ রাখেন। গুলমার্গ মানে ফুলের উপত্যকা। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে তিন কিলোমিটার ব্যাপী এখানে দেশি-বিদেশি ফুলের সমারোহ ঘটে। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে ১৮ পয়েন্টের সেরা গলফ কোর্স রয়েছে গুলমার্গে। খেলার মাঠ ঘিরেই গড়ে উঠছে ছোট্ট পাহাড়ি শহর গুলমার্গ। পাইন ও দেবদারু গাছে ঘেরা এই শহরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। শহরে শিখরধর্মী শিবমন্দির রয়েছে। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে পর্যটকদের ভিড় হয়। ছ'কিলোমিটার দূরে এগারো হাজার ফুট উঁচুতে খিলেনমার্গ। এখান থেকে তুষারাচ্ছাদিত নাঙ্গাপর্বত, হরমুখ, গৌরীশঙ্কর, ত্রিশূলপর্বত পরিষ্কার দেখা যায়। এমনকী শ্রীনগরের ডালহ্রদ, উলার হ্রদও সুন্দরভাবে দেখা যায়।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশ ও রাজধানী

- কিউবা–হাভানা • ব্রাজিল–ব্রাসেলিয়া
- ডেনমার্ক –কেপেনহেগেন
- ফ্রান্স-- প্যারিস • ঘানা --আক্রা
- ইন্দোনেশিয়া–জাকার্তা
- গ্রিস– এথেন্স • অস্ট্রিয়া–ভিয়েনা
- আর্জেন্টিনা –বুয়েনস এয়ারস
- হাঙ্গেরি–বুদাপেস্ট
- ইরান–তেহেরান
- আয়ারল্যান্ড –ডাবলিন
- ইরাক–বাগদাদ
- ইজরায়েল–জেরুজালেম
- মায়ানমার– ইয়াঙ্গন
- দঃ কোরিয়া–সিওল

ভালো কথা

টোটোচালক রাখীদেবী

মেয়েরাও যে সব পারে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার সালেপুরের রাখী বাগ নামে এক মহিলা। দুটি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে টোটো নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা, ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করবেন। তাঁর স্বামী রিকশাভ্যান চালক। স্বামীর উপার্জনের টাকায় ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করানো সম্ভব নয়। তাঁর মেয়ে নাইনে ও ছেলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। সকালে রান্না করে সবাই মিলে খেয়েদেয়ে ছেলে-মেয়েকে স্কুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাখীদেবী। মাঝে তাদের স্কুল থেকে বাড়িতে রেখে আবার বেরিয়ে পড়েন আর রাত ন'টায় ফেরেন। গত দু'বছর ধরে তিনি এভাবেই চালাচ্ছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছেলে-মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করবেনই।

সৃজা সাহা, দ্বাদশ শ্রেণী, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমার ভাই

প্রিয়া হালদার, ষষ্ঠ শ্রেণী, ১৮ মাইল, মালদা।

আমার ভাই খুবই ভালো
মিষ্টি মিষ্টি হাসে
হাঁটতে হাঁটতে পড়ে গেলেই
ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে।

কান্না শুনে সবাই তখন
ছুটে ছুটে আসে
ভাইটি তখন কান্না ভুলে
মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৫।।

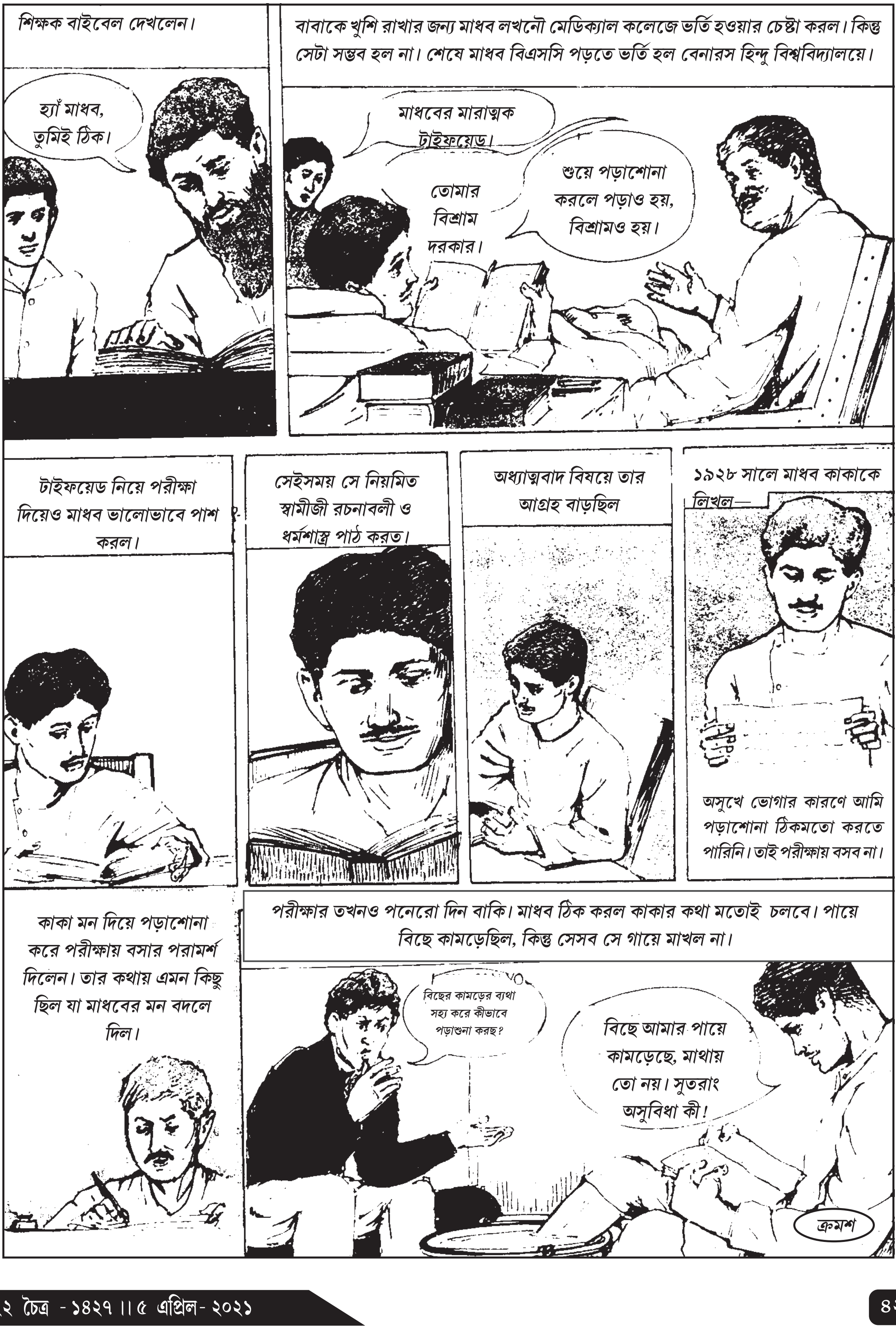

প্রতিকূলতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ বেড়েই চলেছে

ড. জিষ্ণু বসু

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ১৮৯৮ সালে এক পত্রে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে পুনরায় বৈভবশালী করার জন্য এক সংগঠন প্রয়োজন আর তার উৎপত্তি হবে মধ্যভারত থেকে। স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ১৯ বছর পরে মধ্যভারতের একেবারে কেন্দ্রস্থল নাগপুর থেকে একটি যুবক কলকাতায় এলেন। নাম কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। যুবকটি এখানে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত ন্যাশেনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বেঙ্গলের যে মেডিক্যাল কলেজ, সেই ন্যাশেনাল মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন কেশব। তবে ডাক্তারি পড়াটা ছিল ছুতো। আসলে তখন বঙ্গপ্রদেশ ছিল সারা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের তীর্থ। বিপ্লবের সেই গনগনে আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করে ঝকঝকে ইস্পাত হতে চেয়েছিলেন কেশব। বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে নাগপুরের যোগাযোগের জন্য যেমন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (বিএনআর) তেমনই বিপ্লবের রসদ সরবরাহের জন্য যে মানবশৃঙ্খল তৈরি হয়েছিল তার অন্যতম শক্তপোক্ত যোগসূত্র হয়ে উঠলেন কেশব হেডগেওয়ার। বিপ্লবী মহলে তাঁর ছদ্মনাম হয়ে উঠল 'কোকেন'। কেশব রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্যেও মনপ্রাণ দিয়ে অংশ নিলেন। ১৯১৯ সালের দামোদরের ভয়াবহ বন্যায় পীড়িতদের সেবায় দিনরাত এক করে দিলেন কেশব। ডাক্তারি পাশ করে বঙ্গপ্রদেশ থেকে জীবনরচনার রসদ নিয়ে নাগপুরে ফিরে গেলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

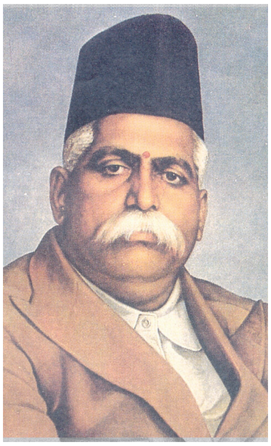

কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন ডাক্তার হেডগেওয়ার। ঘরে তখন দারিদ্র্য। সে যুগে পাশ করা ডাক্তার নাগপুর শহরে কমই ছিল। কিন্তু ডাক্তারি করে দু'পয়সা উপার্জন না করে তিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কাজকে ব্রত হিসেবে নিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন ডাক্তারজীর অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। তিলকের মৃত্যু পর্যন্ত ডাক্তার হেডগেওয়ার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই যখন ১৯২৫ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন তার ভিত্তিভূমিটা বঙ্গপ্রদেশে শুরু হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডাক্তারজীর মনে বঙ্গপ্রদেশের মনীষীদের প্রেরণা, বঙ্গপ্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক আর বঙ্গপ্রদেশের সংস্কৃতি-গাথার প্রতি অমোঘ টান ছিল।

সঙ্ঘকাজ স্থাপনের জন্যও ডাক্তারজী কলকাতাতেই এসেছিলেন। কপর্দকহীন অথচ দৃঢ়চেতা এক মানুষের দেশমাতৃকার জন্য যোগ্য সুপুত্র তৈরির সে প্রয়াস দেখেছে কলকাতা। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মনেও তাই কেশব হেডগেওয়ারের উপর ছিল অগাধ আস্থা। বঙ্গপ্রদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর অন্তর্ধানের পূর্বে দু-দু'বার ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। একবার তিনি তাঁর একান্ত সহযোগী বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথকে পাঠিয়েছিলেন। আর দেশ থেকে নিষ্ক্রমণের ঠিক পূর্বে তিনি মহারাষ্ট্রের অন্যতম গণআন্দোলনের নেতা রামভাউ রুইকরকে নিয়ে এসেছিলেন নাগপুরে ডাক্তার হেডগেওয়ারের কাছে। তাই বঙ্গদেশের যে নবজাগরণ

ফ ঃ ৬

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে আজকের আধুনিক ভারতের রূপ দিয়েছে তার সঙ্গে ডাক্তার হেডগেওয়ারের সাধনা এবং কর্মপথের ছিল অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গপ্রদেশে যে জাগরণের সূচনা হয়েছিল সেটা আসলে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান। 'হিন্দু' শব্দটি যে কেবল উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এটি ভারতবর্ষের মানুষের জাতিগত উত্তরাধিকার। এটা ধীরে ধীরে মনীষীদের ভাবনায় প্রকট হলো। ১৮৮২ সালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাস লিখলেন। দেশমাতৃকাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে বন্দে মাতরম্ গান সংযোজিত হলো ওই উপন্যাসে। ভারতবর্ষ এক নতুন দিগন্ত খুঁজে পেল। পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ এই 'বন্দে মাতরম্'কেই জাতীয় মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। 'বন্দে মাতরম্'—'মা তোমায় বন্দনা করি'—এই মন্ত্রে দেশপ্রেমের জোয়ার এল। বঙ্গের কবি সাহিত্যিকরা সারা দেশের কোনায় কোনায় খুঁজে দেশপ্রেমের আকর সংগ্রহ করতে লাগলেন। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হলো রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' উপাখ্যান। এই গ্রন্থের একটি পঙ্‌ক্তি, ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পড়িব পায় / হায় কে পড়িবে পায়?''

হিংস্র নরপিশাচ আলাউদ্দিন খিলজির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক রাজস্থানের নারী-পুরুষের আমৃত্যু সংগ্রামের এক অশ্রুসজল কাহিনির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীত হয়ে ওঠে এই উপাখ্যান। ওই দুটি লাইন পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণাবিন্দু হিসেবে কাজ করে। স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৩ সালের চিকাগো ধর্ম মহাসভার জয় ছিল হাজার বছরের পরাধীন জাতির মাথা তুলে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। ভারতের হিন্দুদের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজী। সেযুগে ভারত ও হিন্দু শব্দ সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তার থেকেই হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রের নাম, হিন্দু স্কুল, হিন্দু কলেজ বা হিন্দু হস্টেলের নাম। এমনকী ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সময় সময় ভারত ও জার্মানির বৈপ্লবিক গতিবিধিকেও পশ্চিমের সমাজবিদরা বা সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টে সর্বত্রই হিন্দু-জার্মান কন্সপিরেসি বলা হতো। তাই আজকের কোনো বিলেত ফেরত পণ্ডিত যখন হিন্দু হস্টেলের নাম পরিবর্তনের কথা বলেন, তখন বঙ্কিমের কথা মনে আসে, ''ইনি যদি পণ্ডিত তো .....।'' তাই এক কথায় বললে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিষয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতার ছবি নিয়ে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের কথা বলেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এর সঙ্গে উপাসনা পদ্ধতির ভিন্নতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। পারসি মাদাম ভিখাজি কামা-র তাই হিন্দু জার্মান কন্সপিরেসিতে অংশগ্রহণে কোনো অসুবিধাই ছিল না। কাজী নজরুল তাঁর ধূমকেতু পত্রিকাতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' লিখে জেলে গেলেন। বঙ্গদেশের মাটি এইসব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পাদমূলে বসে হিন্দুত্বের পাঠ নিয়েছে। তাই ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণীয় মনে করেছিল। বঙ্গপ্রদেশে সেযুগে কোনো বরেণ্য মানুষের চোখে তা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বা পরমত অসহিষ্ণুতা মনে হয়নি।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার)-র জীবনের সূত্রও বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে জীবনদর্শনের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বঙ্গপ্রদেশের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে আশ্রম স্থাপন করেন। সেই দারিদ্র্য, জলকষ্ট, কুসংস্কারে ভরা এই এলাকায় যখন অখণ্ডনন্দজী সেবকাজে অসাধ্য সাধন করছিলেন। তখন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন ওই মারাঠী যুবক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। সারগাছি আশ্রমে ১৯৩৭ সালে যখন স্বামী অখণ্ডানন্দের শরীর শান্ত হলো, সেইদিন তিনি মাধবের কোলে মাথা রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের মরদেহ মাধব গোলওয়ালকর সঙ্গে করে বেলুড় মঠে নিয়ে এসেছিলেন। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে অখণ্ডানন্দজী গোলওয়ালকারকে বলেছিলেন যে, তিনি যেন তার ছেড়ে আসা রাষ্ট্রগঠনের কাজেই ফিরে যান। গুরুদেবের আদেশ মতো মাধব গোলওয়ালকর আবার তার পূর্বাশ্রমের কাজে ফিরে যান। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় থেকেই মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর ছাত্র সমাজের কাছে গুরুজী হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজে যখন আবার তিনি ফিরে এলেন তখন অগণিত স্বয়ংসেবক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরকে 'শ্রীগুরুজী' বলে নিজেদের হৃদয়ে বরণ করে নিলেন।

সঙ্ঘ যখন একটি অখিল ভারতীয় রূপ পেতে শুরু করল, তখনও প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার বঙ্গপ্রদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। কলকাতার কাজ শুরু করার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে পাঠালেন। ডাক্তারজীর ইচ্ছানুসারে কলকাতার সঙ্ঘকাজের বীজারোপণ করার জন্য এলেন মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। শ্রীগুরুজী কলকাতায় এসে শুধুমাত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গেই সম্পর্ক করেননি, বরং একেবারে মাঠে ময়দানে নেমে যারা দেশমাতৃকার জন্য এই মহান কাজের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেবেন তাদের খোঁজে বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে কাজ করা শুরু করেন। কলকাতার মধ্যস্থলে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান স্কুলের মতো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দীর্ঘ সময় চর্চা করেন, তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে ছেলেদের মধ্যে দেশভক্তি জাগানোর জন্য তাদের সঙ্ঘের শাখায় পাঠান। ১৯৩৯ সালে ডাক্তারজী যখন শ্রীগুরুজীকে সিন্ধি গ্রামের বৈঠকের পর যখন কলকাতায় পাঠালেন তখন এখানে থাকার জায়গাও ছিল না। আমহার্স্ট স্ট্রিট ও আজকের মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থানে হিন্দু মহাসভা অফিসে তাঁর স্থান হলো। তারপর ১নং সরকার বাই লেনের তিনতলার উপর একটি অপরিসর ঘরে স্থান হলো এই মহাতাপসের। ডাক্তারজী কলকাতাতে আসার সময় ১০টি টাকাই তাঁর হাতে দিতে পেরেছিলেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এক পয়সাও খরচ করার উপায় ছিল না। তাই উত্তর কলকাতা থেকে মধ্য কলকাতায় যেতে হলে, যাবার সময় ট্রামে গেলেও ফেরার সময় অবধারিতভাবে হেঁটেই ফিরতে হতো। শ্রীগুরুজী ফিরে গিয়ে ৩ টাকা ৬০ পয়সা ফেরত দিয়েছিলেন।

সেদিন থেকে আজ বঙ্গপ্রদেশের বহু মানুষ সঙ্ঘের আদর্শকে ধ্যেয় করে সমাজের কাজ করে চলেছেন। শাখায় শাখায় দেশভক্ত

চরিত্রবান মানুষের মতো মানুষ গড়ার কাজ করে চলেছেন অবিরত। দেশের জন্য, সমাজের প্রয়োজনে কখনো প্রাণ দিয়েছেন, নতুবা ধূপকাঠির মতো একটু একটু করে নিজেকে নিঃশেষ করে, সমাজসেবা করেছেন। চূড়কা মুর্মুর মতো শাখার মুখ্যশিক্ষকরা যেমন মানুষ গড়েছেন, তেমনই দেশের সুরক্ষার জন্য পাকিস্তানের খান সেনাদের গুলিতে প্রাণ দিতেও দ্বিধা বোধ করেননি। বীর কিশোরের তাজা রক্তে লাল হয়েছিল বালুরঘাটের কাছে চকরামপ্রসাদ গ্রাম। সময়টা ১৯৭১। আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের মুরারীপুর গ্রামের শাখার মাঠে হত্যা করা হলো প্রশান্ত মণ্ডলকে। ১৯৮৪ সালের এই ঘটনার আসামিরা কিন্তু পাকিস্তানি নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হার্মাদরা। বামপন্থীরা কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা পরোক্ষভাবে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ করেছে, কখনো কখনো নির্মমভাবে হত্যাও করেছে। হুগলী জেলার জেলা শারীরিক প্রমুখ ছিলেন দয়াল সিংহরায়। দয়াল ও তাঁর দাদাকে দিনের আলোতে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ক্ষমতাসীন সিপিএম পার্টির গুন্ডারা। রক্তে ভেসেছিল জাঙ্গিপাড়া। কখনো-বা পার্টির ভূমিকা ছিল পরোক্ষ। ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট উত্তর ত্রিপুরার ধোলাই এলাকার কাঞ্চনছড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৪ জন সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে অপহরণ করা হলো। অপরাধ, তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতিদের জন্য সেবাকাজ করতে গিয়েছিলেন। ৬৭ বছরের শ্যামলকান্তি সেন, ৫১ বছর বয়সের দীনেন্দ্রনাথ দে, প্রায় একই বয়সের সুধাময় দত্ত এবং ৩৭ বছরের তরুণ শুভঙ্কর চক্রবর্তী। এই চারজনকে অপহরণ করে ন্যাশেনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরার (NLFT) জঙ্গিরা। সেই সময় ত্রিপুরার বাম সরকার ওই চারজন দেবদুর্লভ কার্যকর্তাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয় জঙ্গিদের। প্রায় এক বছর ধরে অসীম কষ্ট দিয়ে শেষে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁদের। ২০০১ সালেও বামফ্রন্ট সমর্থিত মুসলমান মৌলবাদীরা হত্যা করেছে বাসন্তীর চারজন তরুণ স্বয়ংসেবককে। বাসন্তীর সোনাখালী তখন হয়ে উঠেছিল জেহাদি মুসলমানদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে। একের পর এক অসহায় গরিব ঘরের মেয়েদের মা-বাবার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেত মৌলবাদী দুষ্কৃতীরা। প্রতিবাদ করেছিল সদ্য বিএসসি পাশ করা সঙ্ঘের খণ্ড কার্যবাহ অভিজিৎ সরদার। সঙ্গে ছিল অনাদি নস্কর, পতিতপাবন মণ্ডল ও সুজিত নস্কর। কারোর বয়সই ২২ বছরের গণ্ডি পার হয়নি। এক বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গুন্ডারা এদের তুলে নিয়ে গেল আনওয়ার শেখের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরের উঠোনে এক এক করে জবাই করা হলো চারজনকে। তবু স্বয়ংসেবকরা লড়াই থামায়নি। গত দু'বছর আগে গোসাবার পাঠানখালিতে গণধর্ষণ করা হলো এক নাবালিকাকে। তার প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুন্দরবন জেলা কার্যবাহ সঞ্জয় সিংহ। স্কুল শিক্ষক সঞ্জয় ওই অঞ্চলের তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের মুখে ভাষা ফুটিয়েছেন। ওইসব ধর্ষিতা, নিপিড়ীত তপশিলি মানুষদের খবর নিতে জাতীয় তপশিলি কমিশন আসে পাঠানখালিতে। সেই অপরাধে ২০১৭ সালে ভেঙেচুড়ে তছনছ করা হলো সঞ্জয় সিংহের বাড়ি। আজও সঞ্জয় ও তার স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী দুটো কোলের বাচ্চা নিয়ে গৃহহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক্ষমতাসীন দল ওই অত্যাচারী মৌলবাদী দস্যুদের সর্বপ্রকার সহায়তা করছে।

কেশবরাও দীক্ষিত

বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘের ইতিহাস তাই লাগাতার সংগ্রামের কাহিনি। কিন্তু এই অবিরত সহিংস প্রতিরোধের মধ্যেও সঙ্ঘের কার্যকর্তারা তৈরি করেছেন এক একজন নিঃস্বার্থ, সাহসী, দেশপ্রেমিক, দক্ষ মানুষ, যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সমাজের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একের পর এক অসাধ্য সাধন করেছেন।

বনবাসী সমাজের মানুষরা ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে এসে বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এইসব তপশিলি উপজাতিভুক্ত পরিবারের কোনো ছেলে মেয়ে স্কুলের চৌকাঠ পেরোত না। তাই সরকারি চাকরি বা অন্য সুবিধা শতকরা ১০০ ভাগ হলেও একজন বনবাসীও সেই সুযোগ পেত না। এই ভীষণ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছেন একদল স্বয়ংসেবক। কলকাতার কিছু হৃদয়বান স্বয়ংসেবকের নেতৃত্বে শুরু হলো 'একল অভিযান'— ওয়ান টিচার স্কুল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, গরিব মানুষ স্কুলে না আসতে পারলে স্কুলকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক সেই আদর্শকেই মাথায় রেখে, জঙ্গলের বনবাসীদের মধ্যে যেখানে স্কুল নেই, কেউ পড়াশুনা করে না, সেখানে একজন মাত্র শিক্ষক গিয়ে বাচ্চাদের সরকারি স্কুলে পৌছোবার উপযোগী করে তোলে। তারপর ছাত্রবাসে রেখে তাদের স্নাতক স্তর পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করে। গত তিন দশক ধরে এই মহতী প্রয়াস আজ বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। আজ প্রায় দু'হাজার স্থানে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই মহাজাগরণের ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত সর্বস্বান্ত হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্বয়ংসেবকরা তৈরি করেছিলেন বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি। ২৪ পরগনা জেলা সহ সবকটি জেলায় শিবির করে খাবার,

বস্ত্র, ওষুধ সহ সর্বপ্রকার সহায়তা করার ব্যবস্থা করেছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। সেই সময় সব হারিয়ে এদেশে এসেছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারগুলি। সংসারের সব সুবিধা, সুখী গৃহকোণ থেকে ছিটকে আসা পরিবারগুলি, কারো ঘরের মেয়েটিকে মৌলবাদী গুন্ডারা নিয়ে গেছে, কারো পরিবারের সবাইকে খুন করেছে।

এই এতগুলো বছরে পশ্চিমবঙ্গে অনেক ঘটনা গেছে। পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করে তৈরি হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। শতশত সঙ্ঘস্থান থেকে হাজার হাজার নিঃস্বার্থ স্বয়ংসেবক পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলা তো বটেই সারা ভারতেও ছড়িয়ে গিয়েছেন। বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা ভারতমাতার সেবার ব্রত নিয়ে কখনো ত্রিপুরাতে, কখনো অসমে প্রচারক হয়ে গেছেন, কখনো-বা বিচ্ছিন্নতাবাদের চরম উত্তেজনার সময় অশান্ত পঞ্জাবে অসীম সাহসের সঙ্গে কাজ করেছেন। এতে যেমন অনেক প্রশংসা মিলেছে তেমন অনেক বলিদান হয়েছে।

এই লাগতার মানুষ তৈরি কাজ অবিরত সাধনাতে যুক্ত হয়েছে হাজার বাঙ্গালি যুবক বা অন্য রাজ্য থেকে এসে সঙ্ঘের কাজের মধ্যে নিমগ্ন থেকে কখন যে তিনি নিজেই একজন বাঙ্গালি হয়ে গেছেন, তা নিজেই ভুলে গেছেন। সঙ্ঘস্থান হলো দেশমাতৃকার পূজাবেদী। এই পূজাস্থলে যারা এসেছেন তাদের অনেকেই সারা জীবন এই আদর্শকে হৃদয়ে ধরে রেখেছেন। সঙ্ঘশিক্ষা নিয়েছেন, সঙ্ঘের দায়িত্ব পেয়েছেন, কেউ-বা প্রচারক হয়ে সংসার-গৃহস্থ জীবন ছেড়ে সাধারণ পোশাকের সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন। অনেক মানুষ আবার এমনও আছেন, যারা জীবনের কোনো স্তরে এসেছিলেন সঙ্ঘের শাখায়, তারপর জীবনের গতিতে অন্য কোনো দিকে চলে গেছেন, কিন্তু সঙ্ঘের নামে এখনো তাঁদের চোখ ছলছল করে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এমন একজন স্কুলছুট স্বয়ংসেবক নির্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান বয়স ৮৯ বছর। আজকের রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট ও হরিনাথ দে স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে একটি বড়ো তেলকল ছিল। তেলকলের জায়গায় আজ জীতেন্দ্র নারায়ণ হাসপাতাল হয়েছে। ৩৫ নম্বর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ঠিক পাশের জায়গাটা। তেলকলের পাশের মাঠটা খুব সুন্দর ছিল। একটা পুকুর, পাশে একটা বটগাছ, শাখার পরিবেশটাই সুন্দর হয়ে উঠত। নির্মল কুমার তখন ক্লাস ফাইভে। আহার্স্টস্ট্রিটের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়েছেন। সেই স্কুলের ক্লাস টেনে পড়তেন কালিদাস বসু। কালীদাসদা, শৈলেনদারা নির্মলকে বলল, 'একটা নতুন খেলা শেখাব আসবি?' নির্মল এক পায়ে খাঁড়া। তখন মূল খেলা ছিল লেজিম। কাঠের হাতল আর চেনে বাঁধা চাত্‌কি। কদিন পর থেকেই শুরু হলো কবাডি, খো খো। একেবারে জমে গেল শাখাটা। বিকেল হলেই শাখার মাঠ—খেলা—দেশকে ভালোবাসার গান—স্বামী বিবেকানন্দের কথা, বাণী—খেলার পরে বাদামভাজা খেতে খেতে ঘরে ফেরা। কখনো বা শাখার পর ঝুপ করে পুকুরের জলে ঝাঁপ। বছর কয়েক যেতেই ওরা হাতে পেল লাঠি। নির্মল তখন ক্লাস এইটের কিশোর। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, নির্মলবাবুর মতে উনি কালীদার হাতে তৈরি, ১৯৩৫ সালে তেলকল শাখায় এসেছিলেন। আর সেই সময় দেশাইজী বলেও একজন খুব আসতেন। তবে বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের লিখিত ইতিহাস বা দায়িত্বে থাকা প্রাচীন প্রচারক কার্যকর্তাদের মতে শ্রীগুরুজী ১৯৩৯ সালে আসার পরেই প্রথম শাখা। তবে শ্রী গুরুজীর শাখা দেখতে আসার ঘটনাটা নির্মলবাবুর পরিষ্কার মনে আছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় বোমা থেকে তৈরি হয়েছিল লম্বা লম্বা গর্ত (ট্রেঞ্চ), তাই তেলকলের মাঝেও তৈরি হয়েছিল, মাঠটা ছোট হয়ে গিয়েছিল একটু। সেই ঐতিহাসিক আনন্দঘন মুহূর্ত বলতে গিয়ে এখনও নির্মলবাবু চোখে আনন্দে জল এসে যায়।

এরপর শুরু হয়ে গেল বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালে হাতিবাগানে জাপানি বোমা পড়ল। একটা টিনের শেড উড়ে গেল, মারা গেলেন ৫/৬ জন সাধারণ মানুষ। ব্যাস, কলকাতা জুড়ে তখন চরম অস্থিরতা। ঠিক তার পরেই হলো দুর্ভিক্ষ। বন্ধ হয়ে গেল তেলকলের শাখা। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ একটু কমলে আর একটি শাখা শুরু হলো। সেটা রামমোহন রায় রোড আর সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে। সেযুগের বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষের বাড়ির পিছনে। নির্মল তখন যুবক। বলা হলো সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ নিতে নাগপুরে যেতে হবে। কিন্তু তরুণ নির্মলের সঙ্ঘের কাজ, প্রশিক্ষণের থেকে বেশি আকর্ষণ মনে হলো হিন্দু মহাসভার কাজকর্ম। সেখানে আসতেন হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ। নির্মল ধীরে ধীরে শাখা থেকে দূরে চলে গেল। যুগীপাড়ার বাড়ি থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হিন্দু মহাসভার অফিসে চলে আসতেন।

তখন কলকাতার এক ভয়াবহ অবস্থা। দুর্ভিক্ষ করাল থাবা বসিয়েছে। শ্যামবাজার থেকে ধাপা পর্যন্ত ছিল একটা রেললাইন। লাইনের দুই ধারে দেবদারু গাছ। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি দেবদারু গাছ কেটে দেওয়া হলো। শহরে তখন হাহাকার 'একটু ফ্যান দেবে মা? একটু ফ্যান।' একদিকে মুসলিম লিগ ও একদিকে খাকসার পার্টি। প্রতিদিন গরম হচ্ছে পরিস্থিতি। ১৯৪৬ সালে গাঁজা গলির পাশে খুন হলো নির্মলের বন্ধু প্রতুল ভট্টাচার্য। তখন রেশন শুরু হয়েছে। রেঙ্গুনের সুগন্ধী বালাম চাল ৫ টাকা মন। মানে ৪০ সের/৩৭.৫ কেজি। কাটা পোনা ৮ আনা সের। চন্দ্রৌসী আটা ৭ পয়সা সের। ঝড়িয়ার কয়লার মন ৬ আনা। প্রতুল শুনেছিল বাগমারীতে সস্তায় কয়লা পাওয়া যাচ্ছে। সেই কয়লা নিতে গিয়ে আর সে ফেরেনি। সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তরা সুযোগ ছাড়েনি।

এমন ছোটখাট ঘটনার পরেই এল সেই ভয়ানক দিন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। ময়দান থেকে লিগের ঘোষণা হলো ডাইরেক্ট অ্যাকশানের। সেই রাত্রেই গাঁজা গলি থেকে কাড়ানাকড়া বাজিয়ে ধেয়ে এল 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি। সেই রাত্রে কোনোমতে আটকে দেওয়া গেলেও পরের দিন যুগিপাড়া জুড়ে এক ভয়ের আবহাওয়া। এলাকার বাণীপীঠ গার্লস হাইস্কুলে মেয়েদের হস্টেলও ছিল। প্রধান শিক্ষিকা শ্যামমোহিনী দেবীকে সকলেই শ্রদ্ধা করত। উনি সকালে ডাকলেন সকলকে। ঠিক হলো বিবেকানন্দ রোডের মোড়, গড়পারের মোড় আর রাজাবাজারের মোড়ে বিকাল থেকে ছেলেদের প্রহরা থাকবে। খালের ওপারে কসাইবস্তি থেকেই কাঠের পুল পার হয়ে গতরাতে মুসলমান গুন্ডারা এসেছিল। একটা দল সন্ধ্যা থেকেই সাহেব বাগান থেকে, একদল বাগমারী লালবাগান মোড় পর্যন্ত টহল দেবে।

নির্মল দেখল এলাকার অতি পরিচিত মুখগুলি কেমন অপরিচিত শত্রু হয়ে গেল। গাঁজা পাড়ার হুদা নির্মলের প্রায় সমবয়সি ছিল। একদিন দেখল হুদা একটা লোহার রড নিয়ে পালেদের বাড়ির দরজায় মারছে। নির্মল হুদাকে চিনতে পেরে ছুটে এল। পালেদের বাড়ির তিনটে মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। নির্মল কাছে এসে বলল, ''এই

হুদা কী করছিস?" হুদা নির্মলকে দেখে আপাতত নিরস্ত হলো, উর্দুভাষী হুদা বলতে বলতে গেল 'দুশমন, মার ডালুঙ্গা।'

পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো যখন শহরে পাঠান পুলিশ মোতায়েন হলো। পাঠান পুলিশ পাড়ার মোড়ে মোড়ে হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী ভেঙে দিল। ভয় দেখানোর জন্য ঋষিকেশ পার্কে একদিন সন্ধ্যায় তিন তিনটি ছেলেকে গুলি করে মারল। সেদিন বড়ো অসহায় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শাখার মাঠে হিন্দু সংগঠনের কথা। মনে হাচ্ছিল সত্যিই যদি জাতি, পন্থ ভুলে সংগঠিত হতে পারত হিন্দু সমাজ। নির্মলবাবুর স্মৃতিতে দুটি ঘটনা সেদিন হিন্দুদের কিছুটা ভরসা দিয়েছিল। পাড়াতে জয়সোয়ালদের বড় কালোয়ারি ব্যবসা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লোহা, হেলমেট ইত্যাদি জয়সোয়ালরা পাড়ার যুবকদের জন্য গুদাম খুলে দিল। সবাই শিরস্ত্রাণ পড়ে, হাতে অন্তত একটা লোহার রড নিতে পেরেছিল। কারণ হিন্দুদের ঘরে আত্মরক্ষারও কোনো অস্ত্র ছিল না। ওদের বাড়ির ছেলে লক্ষ্মী জয়সোয়ালও নির্মলদের বন্ধু ছিল। লক্ষ্মী সবসময় এগিয়ে থাকত, একদিন শোনা গেল লক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে গেছে। লক্ষ্মী কিন্তু মাঝরাতে ফিরে এল। লক্ষ্মীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন ডিসি নর্থ দাশগুপ্ত সাহেব। একেবারে কাঠবাঙ্গাল ভদ্রলোক। লক্ষ্মী ফিরে এসেছে সেই আনন্দে চা পকোরা খাওয়া হলো। দাশগুপ্ত সাহেবকেও অনুরোধ করাতে সেদিন চা খেলেন। চা খেতে খেতে বললেন "পালাইবি না, এক্কেরে কামড় দিয়া থাকবি। আমি কি মইর্‌্যা গেছি?"

নির্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এরকম একসময় পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা থেকে ডাক এল। মহারাজা দিলীপ সিংহ বাহাদুর ডেকে পাঠালেন শাখা শুরু করার জন্য। তার ছেলে যুবরাজ সুশান্ত কাশীতে পড়তে গিয়ে সঙ্ঘের শাখা দেখে এসেছে। তাই রাজাসাহেবের ইচ্ছে কুমিল্লাতে শাখা শুরু করার। তখন বঙ্গপ্রদেশের দায়িত্ব নিয়েছেন কালীদাস বসু। জয়দেব ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষের মতো কার্যকর্তরা। ঠিক হলো কালীদা যাবেন কুমিল্লা। ঝড়ঝড়িয়া স্টেশনে নেমে কালীদা রাজবাড়ি যাবেন। রাজামশাই হাতি ও মাহুত পাঠিয়েছিলেন সঙ্ঘের কার্যকর্তাকে নিতে। হাতির হাওদাও উঠে কুমিল্লা রাজবাড়িতে পৌছোলেন কালীদাস বসু। ওপার বাঙ্গলায় মৈমনসিংহতেও শুরু হলো শাখা। সুসঙ্গ গ্রামে তখন বিস্তারক কালীদা। সিন্ধু প্রদেশের এক গ্রামে এক স্বয়ংসেবককে হত্যা করল মুসলমান দুষ্কৃতীরা, সেই খবর সুসঙ্গ গ্রামে আসার পর শাখার মাঠে এই কথা কালীদা বলাতে স্বয়ংসেবকরা অঝোড়ে কাঁদতে থাকল। সেখবর পৌছল নাগপুরে। তখন সঙ্ঘে 'ডেঞ্জার কল' আর 'সারপ্রাইজ কলের' ব্যবস্থা ছিল। এমনই এক সারপ্রাইজ কলে ডাকা বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের সেই সুসঙ্গ গ্রামের স্বয়ংসেবকদের মর্মবেদনার কথা। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সদ্য যুবক কেশবরাও দীক্ষিত।

বঙ্গপ্রদেশ তথা কলকাতা নিয়ে এমনিতেও আগ্রহ ছিলই। তাই শ্রীগুরুজী যখন কলকাতা কেশবরাও দীক্ষিতকে কলকাতার প্রচারক হয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন তখন কেশবজীর মন নেচে উঠল।

আর একজন স্বয়ংসেবক, যিনি সারা জীবনই সঙ্ঘের পথে দেশের জন্য নিজের সবটুকু দিয়েছেন। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে বঙ্গপ্রদেশের মাটিতে এসে একটু একটু করে এখানকার মানুষ হয়ে গেছেন। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় তাঁর নিজের জন্মস্থানে সগৌরবে ফিরে যাওয়ার আহ্বানও ফিরিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ, বাঙ্গলার কাজে তার কী অভিজ্ঞতা?

১৯৩৯ সালে নাগপুরের কাছে সিন্দ্রি গ্রামে একটি বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকের শেষে শ্রীগুরুজী এলেন কলকাতা। শুরু হলো কলকাতার কাজ। সেই সময় বাবু পদ্মরাজ জৈন হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ ও পদ্মরাজ জৈনের আগ্রহ ছিল কলকাতায় প্রভাত শাখা শুরু করার। এর মধ্যে ডাক্তারজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় শ্রীগুরুজীকে নাগপুরে ফিরে যেতে হলো। কলকাতায় এলেন বালাসাহেব দেওরস ও বিঠ্ঠলরাও পাতকি। তখন তেলকলের মাঠে চলছে পুরোদমে শাখা।

১৯৫০ সালের জুন মাসে কেশবজী এলেন কলকাতায়। সবকটি শাখাই উত্তর কলকাতায়। তখন কলকাতায় মাঝে মধ্যেই দীর্ঘকাল থাকতেন ভাইয়াজী দানী, ভাওরাও দেওরস ও একনাথ রানাডে। সত্যি বলতে কী গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পরে যখন সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছিল তখন সঙ্ঘের সর্বময় দায়িত্বে ছিলেন একনাথজী এবং মোরপন্ত পিংলেজী। সেইসময় সম্ভবত একনাথজীর মাথায় ছিল পশ্চিমবঙ্গকে আবার নতুন করে সাজানোর ভাবনা। সেই ভাবনা ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা প্রচারে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করলেন বিবেকানন্দের উপর গবেষণা। ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর বেলুড় মঠ ছিল তাঁর সাধনাস্থল। একনাথজী লিখলেন। তারপরে অবশ্য ১৯৬২ সালে চীনের যুদ্ধে পরাজিত হতোদ্যম জাতিকে পুনরায় জাগরণের জন্য কন্যাকুমারীতে তৈরি করলেন অপূর্ব বিবেকানন্দ শিলা মন্দির। যে সংস্থা আসমুদ্র হিমাচলে স্বামীজীর ভাবনা ছড়িয়ে দেবার কাজ করবে। যখন একনাথজী সঙ্ঘের

দায়িত্ব ছেড়ে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কাজ শুরু করলেন তখন তিনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহ। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের প্রসঙ্গে এই বর্ণনা অপরিহার্য, কারণ একনাথজীর ভাবনা, সাধনা এবং রূপদানের বেশিরভাগটাই কলকাতা থেকে হয়েছিল।

যাই হোক, কেশবরাও দীক্ষিত তো এলেন কলকাতায়। তখন পূর্ববঙ্গে সঙ্ঘচালক ছিলেন ভানু লাহিড়ী। সে সময় স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের মূল কাজ ছিল পূর্ববঙ্গের সব হারানো উদ্বাস্তুদের সেবা করা। ১৯৪৯ সালে শুরু হলো বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির কাজ। ততদিনে অনেকে সময় দিয়ে সঙ্ঘকাজ করছেন। নারায়ণ মল্লিক, শচীন মুখার্জি, সুকুমার ব্যানার্জিরা প্রচারক বের হয়েছেন। সারা ভারতের স্বয়ংসেবকরা উদ্বাস্তুদের জন্য সহায়তা পাঠাতেন। সঙ্ঘের কাজ, কার্যালয়ের খরচের জন্যও সেসময় নাগপুর থেকে খরচের টাকা আসত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে যে গুরুদক্ষিণা করতেন তা ছিল অপ্রতুল। হাওড়ার কাজ তখন খুব জোরকদমে শুরু হলো। দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর মতো কুশল প্রচারক এলেন। আরও পরে যুক্ত হলেন মাস্টারমশায় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী।

কেশবজী নিজে প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করেছিলেন ১৯৩৯ সালে পুনেতে। ৪০ দিনের বর্গ। মাঝে রবিবার করে ছুটি। বর্গস্থান ছেড়ে বাইরে ঘুরে আসতে পারত শিক্ষার্থীরা। ১৯৪০ সালে পুনেতেই দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯৪১ সালে তৃতীয় বর্ষ নাগপুরে। সেই সময় দাদারাও পরমার্থ, বাবাসাহেব আপ্তের মতো শিক্ষক থাকতেন বর্গে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ১৯৪৯ সালে একটা দীর্ঘ প্রাথমিক বর্গ হয়েছিল। তারপর কেশবজী আসার বছরই ১৯৫০ সালের দুর্গাপূজার ছুটিতে দমদমে টম কোম্পনির বাড়িতে হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ। এরপর প্রায় প্রতিবছরই হতে থাকল সঙ্ঘ শিক্ষ বর্গ। ১৯৫৮ সালে হীরেন সরকার মশাইয়ের শ্যামনগর রেল স্কুলে। সেবার অসম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার বর্গ হলো একসঙ্গে কলকাতায়। ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী হলেন সর্বাধিকারী। সেই সময় কলকাতার কাজে প্রাণ এল। মহাকোশল প্রান্ত থেকে এলেন অমল কুমার বসু। মনোহর করকরে তখন প্রান্ত প্রচারক। অমলদা হলেন সহ-প্রান্ত প্রচারক। সেই সময়ই কলকাতা মহানগরের প্রথম সঙ্ঘচালক হলেন হীরেন্দ্রনাথ সরকার।

এরপরে গজানন গোখলে, রামচন্দ্র সহস্রভোজনী, বালকৃষ্ণ নায়েক, কালীদাস সালোড়কর, বসন্তরাও বাপট, মাধব বনহাট্টির মতো উজ্জ্বল, দৃঢ়চেতা ও হৃদয়বান প্রচারক যারা বাঙ্গলার সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন হৃদয় হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন দেশের উপর নামিয়ে আনলেন জরুরি অবস্থার মতো অভিশাপ তখন সারা ভারতে বাম-ডান সব পন্থীদের একান্ত ভরসাস্থল ছিল সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। এক বামপন্থী প্রৌঢ় শ্রমিক নেতা বলছিলেন, সে সময় জেলের মধ্যে কত নিপুণতার সঙ্গে কাজ করতেন সঙ্ঘের স্বয়সেবকরা। জরুরি অবস্থাতে রাজ্যের সঙ্ঘের কার্যকর্তারা জেলের ভেতরে ও বাইরে অসাধারণ কাজ করেছিলেন। দমদম সেন্টাল জেলের মধ্যে ৭ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গও হয়েছিল। জেলার সংশোধনাগার গুলোতে অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়েছেন স্বয়ংসেবক কার্যকর্তারা। কোথাও শাসক দলের পোষা সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা রক্তাক্ত করেছিল সঙ্ঘের দেবদুর্লভ কার্যকর্তাদের। জরুরি অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজকে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী করেছে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক একজন উজ্জ্বল পরিণত নেতৃত্ব। আজও পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের কাজ যাঁদের পথনির্দেশে ভারতমায়ের সেবায় প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে।

সঙ্ঘের কাজ ঐশ্বরীয় কাজ। সারা পৃথিবীতে এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে যে ১০০০ বছরের বেশি মুসলমান বা খ্রিস্টান শাসনের পরেও যেখানে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি টিকে আছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা কোনো উপমহাদেশেই এর উদাহরণ নেই। ব্যতিক্রম কেবল ভারতবর্ষ। আজও এই দেশ হিন্দুরাষ্ট্র। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে হিন্দুজাতির বেঁচে থাকাটা ঈশ্বরের কোনো পরিকল্পনারই অংশ। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মতো, হিন্দুরা এরজন্যই বেঁচে আছে কারণ পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা একমাত্র হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে আছে।

ভারতবর্ষের যে নবজাগরণ সেই সময়ও বঙ্গপ্রদেশের ভূমিকা ছিল অসামান্য। স্বামীজী স্বদেশ মন্ত্র সারা ভারতবর্ষের কথা ভেবেই বাংলাভাষায় লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সারা ভারতবর্ষের জন্যই বাংলাভাষায় (সংস্কৃত সমৃদ্ধ) বন্দে মাতরম্ রচনা করেছেন। প্রমথনাথ মিত্র থেকে পুলিন বিহারী দাস পর্যন্ত দুই বঙ্গে অনুশীলন সমিতি তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য। তাই পশ্চিমবঙ্গকে জাগতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ যদি আফগানিস্তানের মতো হয়ে যায় তবে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। তাই খাগড়াগড়, কালিয়াচক, জুড়ানপুর, ধুলাগড়ে যদি হিন্দুরা হেরে যায় তবে সমগ্র দেশের সুরক্ষার উপরে প্রশ্নচিহ্ন আসবে। আর আজকে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বাঁচিয়ে রাখার কাজটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই করছে অবিরত। বহু অত্যাচার, প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও।

পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকের সামনে আজ এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। এক পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষকে নিজ চর্মচক্ষে দেখে যাওয়ার অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে তাদের। আজকের পরিস্থিতি প্রতিকূল কিন্তু কতটা প্রতিকূল? যেদিন সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে দেওয়া হলো তাঁর থেকেও বেশি কিংবা যেদিন চাঁদ কাজি শ্রীবাস আচার্যের ঘরে ঢুকে লাথি মেরে খোল ভেঙে দিয়ে বলেছিল যে ইসলাম গ্রহণ করতে, তার থেকেও? কিংবা আমার দিদিমা নিজের জীবন আর সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য সিলমান্দির কোনো পানাপুকুরে শুধুমাত্র নাকটুকু বের করে ১৪ ঘণ্টা ডুবে বসেছিলেন। তার থেকেও বেশি খারাপ?

যদি ততটাই খারাপ হয় তবু আমরা কাজ করব। আর আজ এটা ভেবে লাভ নেই আমার সামর্থ্যে আমার দ্বারা হবে কিনা। এটা ভাবলে আমার ১৪ পুরুষ আগের পূর্বপুরুষ নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সাহস করে সংকীর্তনে বের হতেন না। যুগীপাড়ায় নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মী জয়সোয়াল প্রাণ বাজি রেখে লড়তেন না। আজ আমার ভাববার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে আমাকে কী করতে হবে। ব্যাস, যদি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক বাঁচে তবেই আজ থেকে আরও ১৫০ বছর পরে কেউ বাংলাভাষায় বিবেকানন্দের বাণী বলতে পারবে। বুকে সেই প্রত্যয় নিয়েই সকাল-সন্ধ্যা শাখার মাঠে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

'মহা মঙ্গলে পুণ্যভূমে তদর্থে
পততেষ কায়ে নমস্তে নমস্তে।'

(বর্ষপ্রতিপদ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

কর্মযোগী গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনাবসান

অসীম বিশ্বাস

২০১৬ সালে, আগরতলা সেবাধামে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের দীক্ষান্ত সমারোপ। আপনি আগ্রহ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজে পূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য কে কে তৈরি আছ? যারা হাত তুলেছিল, এদের মধ্যে আমিও সেদিন ছিলাম। ২০১৬ পর ২০১৭ দ্বিতীয় বর্ষ, ২০১৯ তৃতীয় বর্ষ, আমার আর পূর্ণ সময় দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠছিল না। ২০২০ সালের ১৪ ডিসেম্বর, দুল্লভছড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভবনে দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক সঞ্জয় কুমার দেব যখন আমার নাম ঘোষণা করেন বিস্তারক হিসেবে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে দূরভাষে জানানোর ইচ্ছে জেগেছিল মনে। আপনার অসুস্থতার খবর পেয়ে সেদিন জানাতে পারিনি। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে জানাবো, কিন্তু আর সেই সুযোগটাই রাখলেন না আপনি। আপনি চলে গেছেন ঠিকই, অনেক কিছুই শিখিয়ে গেছেন আমাদের। সেই শৈশবকাল থেকেই তো আপনি দেশ মাতৃকার সেবায় কর্তব্যনিষ্ঠ। আপনি বুঝেছিলেন, তাই সেই শিশুকাল থেকে সঙ্ঘের শাখায় যেতেন। জীবনে অনেককেই সেই রাস্তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রী চিন্তা বিহনে বাঁচা কত কষ্টের তা আর আপনার থেকে অধিক কজনেই জানে! ক্ষমতার লালসায় মাতৃভূমির যে ডান হাতটি কাটা পড়েছিল সেই জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার ছাতক মহকুমার মহবতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১১ অগ্রহায়ণ, রবিবার রাত আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মা সুষমা দেবীর কোল আলো করে এসেছিলেন আপনি। সেদিন হয়তো পিতা খগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী ও মা সুষমা দেবীও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ছেলে যেন দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থাকে।

বাবা খগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন চিকিৎসক। নিজের ভুইয়ে থাকতে দিলো না জেহাদিরা! সব মায়ার বাঁধন কেটে চলে এলেন সবুজে ঘেরা ভারতভূমির জালালপুর চা-বাগানে।

বাগানের চিকিৎসালয়ে চিকিৎসক তখন তিনি। আপনি শাখায় গিয়ে সঙ্ঘকে জানার পাশাপাশি জালালপুর চা-বাগান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। মেধাবী তো আপনি জন্মগতই। জালালপুর বলেশ্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক) থেকে অসমের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন আপনি। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য গৌহাটিতে যান আপনি। সেখানে কটন মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হলেন। প্রি ইউনিভার্সিটি উত্তীর্ণ হয়ে ওই মহাবিদ্যালয় থেকেই আপনি পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হলেন। এরপর আপনি পাড়ি দিলেন সদূর হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে চলে এলেন রাজধানী দিল্লি মহানগরে। এখান থেকেই আপনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইনে স্নাতক হয়ে ব্যক্তি জীবনে অর্থ উপার্জন করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৌড়ে শামিল হলেন না আপনি। আপনি যে ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার, সেটা আপনার পথচয়নেই ধরা পড়েছে। ব্যক্তিজীবন পরিহার করে রাষ্ট্রজীবনে সমর্পিত হয়ে দিল্লি মহানগরে প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য দেশমায়ের সেবার ব্রত নেন আপনি। সেটা ১৯৪৭ সাল। দীর্ঘ চার বছর পর ফেরেন অসমে। ১৯৭৮ সাল থেকে পূর্ব ভারতের গৌহাটি হানগর প্রচারক হন আপনি। এক কঠিন সময়ের সাক্ষী হন আপনি। ১৯৮৩ সাল অবধি আপনি গৌহাটি মহানগরের প্রচারক ছিলেন। ১৯৮৩ সালেই আপনি সঙ্ঘের ডিব্রুগড় বিভাগের বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব নেন। তখন আপনি তৎকালীন অসম প্রান্তের (বর্তমান অসম ক্ষেত্র) প্রান্ত শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ওই দুটি দায়িত্ব পালনের পর ১৯৯১ সালে শিলচর সম্ভাগ (বর্তমান দক্ষিণ অসম প্রান্ত) প্রচারকের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। ১৯৯৪ সালে বর্তমান ত্রিপুরা, মণিপুর ও বর্তমান দক্ষিণ অসম প্রান্ত যোগে যে তৎকালীন দক্ষিণ অসম প্রান্ত ছিল তার প্রথম প্রান্ত প্রচারক হন আপনি। আপনার নেতৃত্বে সঙ্ঘের শাখার মাঠে এক নতুন উন্মাদনায় এ অঞ্চলে স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা বেড়ে চলে। ২০০১ সাল পর্যন্ত আপনি দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। ওই বছরই আপনাকে বর্তমান অসম ক্ষেত্রের ক্ষেত্র শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ ঘোষণা করা হয়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত আপনি অসম ক্ষেত্রের শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ২০০৭ সাল থেকে ওই ক্ষেত্রের ক্ষেত্র-সহ প্রচারক হোন আপনি। এরপর আপনি সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরণীতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

আপনার শরীরে একসময় ধরে কঠিন ব্যাধি— ২০১৩ সালে কর্কট রোগাক্রান্ত হন আপনি। লড়াই করে এগিয়ে যাওয়া আপনার চরিত্র। আপনি এখানেও এগিয়ে চলেছিলেন। ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। ২০১৮ সালে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে ব্যথা পান আপনি। অস্ত্রোপচারের ফলে ধীরে ধীরে ফের সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। ২০২০ সালে আগস্ট মাসে করোনা আক্রান্ত হন আপনি। ক্রমশ আপনাকে দুর্বল করে এই ব্যাধি। অপরন্তু আপনার শরীরে যক্ষ্মার সংক্রমণ ধরা পড়ে। ফের দিল্লিতে চিকিৎসাধীন হন। দিল্লির এমডিসিটি হাসপাতালে আপনি চিকিৎসা চলাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবনে ব্যস্ততার মধ্যে সাহিত্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন আপনি। অনেকগুলো বই হিন্দি থেকে অসমীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন। লিখেছেন অনেকগুলো গান। কবিতা রচনায়ও আপনার উৎসাহ ছিল। শ্রীগুরুজী সমগ্র হিন্দি থেকে অসমীয় ভাষায় অনুবাদ আপনার এক অন্যতম কার্য।

গত করোনাকালে আপনার একটি বাস্তব লিখনি-গাথা হচ্ছে 'কোয়ারেন্টাইন' নামক গ্রন্থ। বইটি আপনি অসমীয় ভাষায় লিখেছেন। খুব সহজ ও সরল ভাষায় আপনি অনেক বিষয় উপস্থাপন করেছেন গ্রন্থটিতে। ওই গ্রন্থে আপনি রেডিয়োর কথা উল্লেখ করেন। কার্যবিহীন অফুরন্ত সময়ে কী করবেন, কীভাবে কাটবে ওই ভাবনা থেকে লেখার কাজ শুরু করার কথা বলেছেন আপনি। এছাড়া বলেছেন, আপনি। এছাড়া বলেছেন, 'কেউ পড়বে না জানি, তথাপি কিছু একটা করছি বলে মনটা ভালো থাকবে।'

২৪ মার্চ, ২০২১ (১০ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) সকাল ৬ ঘটিকায় চিকিৎসকদের অপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও আপনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

(লেখক শিলচর নগর বিস্তারক)

পরলোকে মানিক চন্দ্র ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক, চুঁচুড়া মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় সঙ্ঘের কাজের প্রসারে অন্যতম পুরোধা মাখাণ্ডি গ্রামনিবাসী মানিক চন্দ্র ঘোষ গত ২৭ মার্চ পরলোকগমন করেছেন। বছর দুই আগে তিনি স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন। অপারেশনের পর ও বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। সঙ্ঘের কাজ আর তেমন করতে পারবেন না— এই বেদনার কথা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পিতা নিরাপদ ও মা বীণাপাণি ঘোষ। তিনি অকৃতদার ছিলেন। দু' বছর আগে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হয়। তাঁর ছোটো ভাই দুলাল চন্দ্র ঘোষ প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক। পাঁচ বোন, ভ্রাতৃবধূ, ভাইপো ও ভাইঝি নিয়ে তাঁর ছোটো পরিবার হলেও স্বয়ংসেবকদের অবাধ যাতায়াতে তা হয়ে উঠেছিল এক বড়ো পরিবারের সমতুল।

তরুণ বয়সেই তিনি স্বয়ংসেবক হন। তাঁর গ্রাম মাখাণ্ডিতে শাখা শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। তিনি স্থানীয় ইটাচুনা কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নন-টিচিং স্টাফ' হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি সঙ্ঘের কাজের প্রসারে নিরন্তর প্রয়াস। সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষাও গ্রহণ করেন। জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষা ও সঙ্ঘের কাজের

উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯২ সালে বাবরি ধাঁচা ভাঙার অজুহাতে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৯০ সালে করসেবার জন্য অযোধ্যার উদ্দেশে গিয়েছিলেন বারাণসীতে তাদের সেই দলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য, কলকাতার স্বয়ংসেবক দুই ভাই রাম ও শরদ কোঠারী এই কসসেবা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এক সময় সঙ্ঘের হুগলী জেলার সহ-কার্যবাহ ও পরে বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন।

ভ্রমণ ছিল তাঁর খুব প্রিয়। প্রতিবছর প্রায় নিয়ম করে পূজার ছুটিতে এক-দুজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, জয়সলমীরের মরুভূমি থেকে পুরীর সমুদ্র সৈকত, বিশেষত হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের জন্য নয়, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে জানতে বুঝতেই তাঁর ওই পরিক্রমা। ঈশ্বরের আশীর্বাদও ছিল বুঝি তাঁর এই পরিক্রমায়। তা না হলে সুদূর লাদাখে সিন্ধু উৎসবে কিংবা কদিন আগে যেখানে যুদ্ধের গোলাগুলি চলছে, সেই প্যাংগং লেকের জলস্পর্শও করেছিলেন। সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গে 'ভারত দর্শন'-এর কার্যক্রম থেকেই বোধহয় তিনি পেয়েছিলেন ভারত তীর্থ পরিক্রমার প্রেরণা। পাশাপাশি বই পড়াও তাঁর সখ। বই কিনতেন, পড়তেন ও সুযোগ পেলে তা নিয়েও চর্চা করতেন। বিশেষত আধ্যাত্মিক সাহিত্যই তাঁর পাঠ্য ছিল। 'বশিষ্ঠ রামায়ণ' পাঠের আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেটা তাঁর আর পড়া হয়ে উঠল না। আর সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র ছিলেন গ্রাহক, নিয়মিত পাঠক এবং তা প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি স্বস্তিকার গ্রাহক সদস্যের নবীকরণ করিয়েছেন। তিনি স্থানীয় এলাকায় সঙ্ঘের নবীন প্রজন্মের কাছে অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তাঁর সরল সাধারণ জীবন যা আর্থিক সম্পদে বা পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ না হলেও পার্থিব কোনও চাহিদা না রেখে সমাজের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম, সমর্পণ ভাবনা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই তাঁকে সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণার উৎস। তাঁর মতো একজন মানুষকে হারিয়ে স্বয়ংসেবকরা তাই শোকাহত। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। □

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে
জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে
ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী
অনুপম ঘোষ-কে
বিজেপি
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন
জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে স্থানীয় জনগণের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি—
শিল্প ও কৃষি সমৃদ্ধ এলাকার পুরনো দিনের তালা নির্মাণ শিল্প ও চশমার লেন্স তৈরি শিল্প, সোনা-রুপোর শিল্প, দর্জি, জরি এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির কুটির শিল্পগুলিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিভিন্ন ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও রোজগারের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা।
ধান ও বাদাম থেকে একাধিক উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
ডোমজুড়ের নারনা পঞ্চানন্দ, ভুলেশ্বর, ইসকনের মন্দির, মুন্সিরহাটের লোকনাথ মন্দিরের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
হাওড়া-আমতা লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করা।
জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে ওঠা এই বিধানসভার অন্তর্গত কারখানার শ্রমিকদের সরাসরি মালিকের অধীনে আনার ব্যবস্থা করা। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা ও ন্যায্য মজুরির জন্য প্রচেষ্টা করা।
এই চিহ্নে ভোট দিন
ADVT

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021
5 April - 2021 - Rs. 12.00

CROSSFADE CREATION

বিজেপি

ভিক্ষা নয় আত্মনির্ভরতা
কুৎসা নয় সম্মিলিত উদ্যোগ
হিংসা, তোষণ, দুর্নীতির পরিবর্তে
মহিলা উন্নয়ন ও সুরক্ষা

১৭৪ সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রে
ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী

প্রভাকর পন্ডিত কে জয়যুক্ত করুন।

সম্মানীয় নাগরিকবৃন্দ,

আমি শ্রী প্রভাকর পণ্ডিত, সাঁকরাইল বিধানসভার অন্তর্গত কান্দুয়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। বাল্যকালে পিতামাতাকে হারিয়ে মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছি। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে পড়াশোনা ও তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি। সমাজের বৃহত্তর অংশের জন্য সেবার উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করি ২০১৫ সালে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাঁকরাইল কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলাম। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি পরিষেবা দিয়ে মানুষের সেবা করার চেষ্টা করেছি। করোনা ও আমফানের সময় সাধ্যমত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। আসন্ন ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য দল আমাকে সাঁকরাইল বিধানসভা (সংরক্ষিত) আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে পুনরায় আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছে। তাই পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সেবাকার্য আন্তরিকতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ একান্তভাবে কামনা করছি।

আপনাদের আশীর্বাদে আমি নিম্নলিখিত কার্যগুলি সুসম্পন্ন করতে সদা সচেষ্ট থাকবঃ-

- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।
- শ্রমিকদের আট ঘন্টার কাজ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবো।
- বিধানসভা কেন্দ্রে র স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক উন্নতি সাধন করতে ও মহিয়াড়ি লক্ষ্মীকমল হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এ পরিণত করতে সচেষ্ট হবো।
- বিধানসভা কেন্দ্রে র অন্তর্গত সমস্ত খাল বিশেষ করে সরস্বতী খালের সংস্কার করতে উদ্যোগী হবো।
- সাঁকরাইল স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এ যাতায়াতের সুবিধার জন্য আন্ডারপাস অথবা উড়ালপুল নির্মাণ করতে উদ্যোগী হবো।
- আন্দুল ও সাঁকরাইল ৬৯ নম্বর বাস রুটের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি রূপায়ণ করতে সচেষ্ট হবো।
- বিধানসভা কেন্দ্রে র হিন্দিভাষী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের সমস্যা এই এলাকার একটি হিন্দি মাধ্যমের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হবো।
- আন্দুল-মৌড়ীতে সংস্কৃতির বিকাশে একটি আধুনিক মানের কমিউনিটি হল নির্মাণ করতে উদ্যোগী হবো।

উপরিউক্ত কার্যগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করব এবং এই মুহূর্তে কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। এছাড়াও আমি শ্রী প্রভাকর পণ্ডিত এবং আমার পার্টি সর্বদা আপনাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাই আগামী ২০২১ মঙ্গলবার আপনি সপরিবারে নির্ভয়ে নিজস্ব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে সকাল সকাল পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপি-কে এবং প্রভাকর পণ্ডিত কে বিপুল ভোটে জয়ী করুন, নতুন বাংলা করতে সহযোগিতা করুন।

নমস্কারান্তে
বিনীত
শ্রী প্রভাকর পণ্ডিত

বন্দেমাতরম
ভারত-মাতা-কি জয়

বাংলায় আসল পরিবর্তন আনতে এবার বিজেপিকে ভোট দিন।

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা।।